পৌরাণিক দণ্ডকারণ্যে জনাকয়েক অনুসন্ধিৎসু

প্রাককথন

-খবরটা শুনেছেন?
বনের মধ্যে বাইরের কাউকে ঢুকতেই দিচ্ছে না...
-কেন? কী হল আবার?
-কেউ বনের কাছাকাছি গেলেই সিআরপি অমনি রাইফেল উঁচিয়ে বলছে, দূর হটো! এখানে মাও দমন চলছে। বাইরে থেকে কারও যাওয়া মানা!
-যেতে দেবে না মানে? ইয়ার্কি নাকি?
স্বাধীন দেশের নাগরিক আমরা, কোথায় যাব না যাব, সিআরপি বলার কে?
-ভায়া, ওদের হাতে যে ইনস্যাস রাইফেল। বারণ করলে না শুনে উপায় কি?
-সে যাই হোক, আমরা যাব।
-আরে, যাব বললেই কি হয়? এই তো কিছুদিন আগে জনসাতেক গিয়েছিল ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংয়ে। পুলিশ জানতে পেরে সবাইকে জেলে পুরে দিল।
-তা হোক। আমরা আবার যাব।
-কীভাবে যাব?
-কেন, সারা দেশ থেকে লোকজন জুটিয়ে বড় টিম নিয়ে যাব। দেখি কেমন ঢুকতে না দেয়!

এপ্রিল, ২০১৭

এখন ভরা গ্রীষ্ম। তার মধ্যে নাগপুরে সিডিআরও-র সম্মেলন। ওখানেই দণ্ডকারণ্যের খবর শুনলাম।

সিডিআরও পুরো কথাটা হল কমিটি ফর ডেমোক্র্যাটিক রাইটস অর্গানাইজেশনস। সারা দেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ। পশ্চিমবঙ্গের এপিডিআর অর্থাৎ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি সেই যৌথ মঞ্চের শরিক। আমি এপিডিআরের প্রতিনিধি হয়ে নাগপুরে গিয়েছিলাম। সেখানেই অনেকে বলাবলি করছিল, দণ্ডকারণ্যে এখন বাইরের লোকজনের ঢোকা মানা। বনের মধ্যে মাওবাদী দমন চলছে, খুনখারাপি, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নারীর সম্ভ্রমহানি, সব হচ্ছে, এই সময় মানবাধিকার কর্মীরা গেলে সিআরপি-র অসুবিধা।

সেকথা শুনে অনেকে ক্ষেপে আগুন।

-কী? সিআরপি-র কথা শুনে আমরা পিছিয়ে আসব? কভি নেহি। আমাদের যেতেই হবে।

তারপর কয়েক মাসের চেষ্টায় নানা রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে দিব্যি তৈরি হয়ে গেল তদন্তকারী টিম। তারা দণ্ডকারণ্যে গিয়ে দেখবে, মাওবাদী দমনের নামে কী হচ্ছে সেখানে।

সেই টিমে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আছি চারজন। আমি, অলক কুমার দাস, শ্যামসুন্দর ঘাটা আর দেবেন দাস। ওই তিনজনের বয়স ষাটের আশপাশে। তাঁরা সোদপুর-আগরপাড়া-খড়দা এলাকার বাসিন্দা। আগে ওই সব অঞ্চলে বামপন্থী আন্দোলন খুব শক্তিশালী ছিল, এখনও তার রেশ অনুভব করা যায়। ফলত ওখানে এপিডিআর বেশ জমজমাট। অলকবাবুরা সকলে তার সদস্য।

আমরা দশই আগস্ট রওনা হব বলে ঠিক হয়েছে। সিডিআরও থেকে বলে দিয়েছে, যারা দণ্ডকারণ্যে যাচ্ছে, তারা যেন আধার কার্ড সঙ্গে রাখে। সিআরপি যে কোনও সময় চেক করতে পারে। পরিচয়পত্র না দেখাতে পারলে মাওবাদী বলে সোজা জেলে ঢুকিয়ে দেবে।

আমার মনে হয়েছিল, আধার কার্ড থাকলেই বা জেলে ঢোকাতে কতক্ষণ! জি এন সাইবাবার তো আধার কার্ড ছিল, তাতেও তাঁকে বন্দি করতে কোনও অসুবিধা হয়নি। সে যাই হোক, বলেছে যখন আধার কার্ড সঙ্গে নিতেই হবে।

আগস্টের শুরুতে যাওয়ার প্রস্তুতি প্রায় শেষ, এমন সময় আমার পাকযন্ত্র বিদ্রোহ করে বসল। কিছুই হজম হয় না। ডাক্তার-বদ্যি সবাই ফেল। আমি তখন মনে মনে ভাবছি যাব কিনা। শুভানুধ্যায়ীরাও অনেকে বুঝিয়ে বলছিল, এই শরীর নিয়ে কি জঙ্গলে যাওয়া যায় ভাই?

এমন সময় আমার মনে পড়ল সেই হৃদয়বান যুবকটির কথা। জন্মাবধি মারাত্মক হাঁপানি রোগে ভুগত। অশক্ত শরীর নিয়েই সে যোগ দিল বিপ্লবীদের দলে। বিরাশি জন মিলে এক লড়ঝড়ে জাহাজে চেপে চলল কিউবায়। তার নাম আর্নেস্টো রাফায়েল গুয়েভারা ডি লা সেরনা। সারা দুনিয়া তাকে চে গুয়েভারা নামে জানে।

চে-র তুলনায় আমার অসুখ তেমন গুরুতর কিছু নয়। আমাদের কার্যক্রমও নিতান্ত নিরীহ ধরনের। আমরা অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে যাচ্ছি না। আমাদের উদ্দেশ্য, দণ্ডকারণ্যে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং।

১

বনের রাজা দণ্ডকবন।

ভারতবর্ষের ঠিক মধ্যভাগে বহু যোজন জুড়ে এই অরণ্যের অবস্থান। রামচন্দ্র তাঁর বনবাস পর্বের সিংহভাগ এই অরণ্যে কাটিয়েছিলেন। অনেক আগে একথা পড়েছিলাম।

ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংয়ে রওনা হওয়ার আগে আরও একবার রামায়ণ খুলে বসলাম। কেননা পুরাণের মধ্যে বহু প্রাচীন যুগের ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায়। আমি দণ্ডকারণ্যে গিয়ে যা দেখব আর শুনব, তাকে বিশ্লেষণ করব সেই ইতিহাসের প্রেক্ষিতে।

পুরাণে আছে, একদা দণ্ড নামে এক রাজা এই বনের অধিপতি ছিলেন। তাঁর থেকেই নাম হয়েছে দণ্ডকারণ্য।

দণ্ডের পিতার নাম ইক্ষাকু। তিনি রামচন্দ্রেরও পূর্বপুরুষ।

দণ্ডের স্বভাবটি ছিল অতি উগ্র। তাই পিতা তাঁকে লোকালয় থেকে বহিষ্কার করে অরণ্যে পাঠিয়ে দেন। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অগস্ত্য মুনি এই প্রসঙ্গে রামকে বলছেন,

ইক্ষাকু কনিষ্ঠ পুত্র হইল পাষণ্ড
দুরাচার দেখি রাজা নাম দিল দণ্ড
সূর্য্যবংশে জন্মি দণ্ড করে অনাচার
পর্ব্বত মাঝারে তারে দিল রাজ্যভার

পিতার আদেশে দণ্ড অরণ্যের মাঝে ঋষ্যশৃঙ্গ পর্বতে বাস করতে লাগলেন। পর্বতের চারপাশ জুড়ে গড়ে তুললেন নিজের রাজধানী। রাজত্ব করতে লাগলেন সেই গহন অরণ্যে।

কিন্তু দণ্ডের মতো অসংযমী পুরুষ বেশিদিন শান্তিতে কাটাতে পারলেন না। নিজের স্বভাবদোষে বিপদ ডেকে আনলেন।

রাজা একদিন তাঁর গুরুদেব শুক্রাচার্যের বাড়িতে গিয়ে জানতে পারলেন, তিনি বাড়ি নেই। বাড়িতে একাকী আছে তাঁর কিশোরী কন্যা। সে পরমাসুন্দরী। নাম অবজা। দণ্ড তাকে দেখে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন।

লম্পট রাজা অনেক ছলাকলা জানতেন, তিনি শুক্র-তনয়াকে লোভ দেখালেন,

আমার রমণী হৈলে হব তব দাস
তোমা বিনা আর নারী না লইব পাশ

অবজা সরলা বালিকা হলে কী হবে, নিজের সম্মান সম্পর্কে খুব সচেতন। সে রাজার ওইসব তোষামুদে কথা শুনে বলছে,

মোর পিতা হয় তব কুলপুরোহিত
আমার সহিত রঙ্গ না হয় উচিত

মহাপরাক্রমশালী রাজা অবলা কিশোরীর কথায় কান দেবেন কেন? পিতার অনুপস্থিতির সুযোগে শূন্য গৃহে তিনি সেই বনবালার সম্মান হরণ করলেন। কিন্তু অচিরে রাজার সম্বিত ফিরল, কাজটা ভালো হয়নি। এই ভেবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সত্বর আশ্রম থেকে পলায়ন করলেন।

শুক্রাচার্য যথাকালে জানতে পারলেন সব। মুনিবর বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন, আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি হোক। তাতে রাজা পুড়ে মরুক।

তারপর,

অগ্নিবৃষ্টি রাজ্যেতে হইল সাত রাতি
সবংশে পুড়িয়া মরে দণ্ড নরপতি
ঘোড়া হাতি পুড়ে আর যতেক ভাণ্ডার
শতেক যোজন পুড়ি হইল অঙ্গার

এইভাবে পুরো দণ্ডকারণ্য ছারখার হয়ে গেল।

পরে অবশ্য সেই অরণ্য পুনরায় নানাবিধ বৃক্ষে, পত্রেপুষ্পে সুশোভিত হয়ে উঠেছিল। রাজা দণ্ড সবংশে ভস্ম হয়ে যাওয়ার বহু যুগ পরে রামচন্দ্র, জানকীদেবী ও লক্ষ্মণ গিয়েছিলেন দণ্ডকারণ্যে।

রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে আছে, তাঁরা যখন বনের মধ্যে দিয়ে চলেছেন, তখন

ফল পুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদিত
ময়ূরের কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত

এমন রম্য অরণ্যের মধ্যে ছিল মুনিঋষিদের তপোবন। আর থাকত দুর্ধর্ষ রাক্ষসের দল। ওই অরণ্যে লংকার রাবণ রাজার উপনিবেশ ছিল। সেখানে খর ও দূষণ নামে দুই রাক্ষস সেনাপতি ছিলেন। তাঁরা রাবণের প্রতিনিধি হয়ে বনাঞ্চল শাসন করতেন। রামচন্দ্র তাঁর বনবাসকালে খর, দূষণ সহ রাক্ষসদের এক বিরাট বাহিনীকে সংহার করেন।

এ হল ত্রেতাযুগের কথা।

এই কলিযুগে রামচন্দ্রের ভক্তরা দণ্ডকারণ্যে মাওবাদী সংহারে নেমেছেন।

আমরা জানি, পুরাণ আর মহাকাব্যে যাদের রাক্ষস খোক্কস বলা আছে, তারা প্রকৃতপক্ষে অরণ্যবাসী অনার্যের দল। তাদের সঙ্গে আর্যদের চিরকালের শত্রুতা। সুদূর অতীতকালে বহুবার দুই পক্ষের মধ্যে ভীষণ লড়াই হয়েছিল। আর্য ঋষিরা কল্পনা করতেন, রাক্ষস নিধনের জন্য ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং রামচন্দ্র রূপে ধরায় অবতীর্ণ হবেন। তাঁর অমিত তেজের সম্মুখে শত্রু সবংশে ধ্বংস হবে।

দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের পরে ব্রাহ্মণ্যবাদী আর্য সভ্যতা সত্যিই অনার্যদের পরাস্ত করেছিল। তবে আর্য ঋষিরা যেমন চাইতেন, পুরোপুরি তেমনটা হয়নি। অনার্যরা সবংশে ধ্বংস হয়নি। তারা এখনও দণ্ডকারণ্যের অভ্যন্তরে ছোট ছোট গ্রামে কুঁড়ে বানিয়ে বাস করে। লোকগুলি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, খর্বাকৃতি এবং প্রকৃতির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। বর্তমান যুগে তারাই মাওবাদী।

অনার্যরা গত শতকের আটের দশক থেকে ধীরে ধীরে মাওবাদী মতাদর্শে দীক্ষিত হয়েছে। মাও সে তুংয়ের তত্ত্ব তাদের শিখিয়েছে কেমন করে নিরন্ন মানুষ সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মহা পরাক্রমশালী শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে। তারা ওইসব শিখে কয়েক দশক যাবৎ আর্যাবর্তের শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

ওই গভীর ও শ্বাপদসংকুল অরণ্যভূমিতে অদ্যাবধি পৌরাণিক যুগ শেষ হয়নি। আগে ওখানে আর্য আর অনার্যদের মধ্যে লড়াই হত, এখনকার দিনে আর্যসভ্যতার প্রতিভূ ভারত রাষ্ট্র এবং অনার্য মাওবাদীদের গেরিলা বাহিনী পরস্পরের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত।

এস ওয়াজেদ আলির লেখা থেকে ধার করে বলা যায়, সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে।

২

মাওবাদীরা বরাবরই বলে, এ হল দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ। দণ্ডকারণ্যের সংগ্রাম আরও অনেকদিন চলবে। সরকারপক্ষ থেকে আগে বলত, দু'বছরের মধ্যে বিদ্রোহীদের মেরে নিকেশ করে দেব। এখন আর বলে না। মনে হয়, তারাও মেনে নিয়েছে, লড়াই বহুদিন চলবে।

প্রশ্ন হল, এর চূড়ান্ত পরিণতি কী? কে জিতবে শেষপর্যন্ত?

ইতিপূর্বে যতবার আদিবাসীরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে, প্রত্যেক বার পরাস্ত হয়েছে। সাঁওতাল, মুন্ডা ও অন্যান্য বিদ্রোহী উপজাতিকে শত্রু একেবারে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিয়েছে। এবারও কি তাই হবে?

আমার মনে আশা ছিল, দণ্ডকারণ্যে তথ্যানুসন্ধানী দলের সঙ্গে গেলে এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে। রওনা হওয়ার আগে একবার রামায়ণ ঘেঁটে দেখেছিলাম, দণ্ডকারণ্য নিয়ে বাল্মীকি কী লিখে গেছেন। অতীতের প্রেক্ষিতে বর্তমানকে বিচার-বিশ্লেষণ করে আন্দাজ করা যাবে, ভবিষ্যতে কী হতে চলেছে।

তারপরে মনে হল শুধু রামায়ণ পড়লেই হবে না, দণ্ডকারণ্যের গত কয়েক দশকের ইতিহাস, ভূপ্রকৃতি, বনজ সম্পদ ও জনজাতিদের নিয়েও কিছু জানা দরকার। তবে বোঝা যাবে, ওখানে চলমান যুদ্ধের অভিমুখ কোন দিকে।

আমি সংশ্লিষ্ট বইপত্র ঘেঁটে যতদূর জানতে পেরেছি তা এইরকম,

গত ষাট-সত্তর বছরে যন্ত্রসভ্যতার দৌলতে ওই বনভূমির বিস্তার কমে গিয়েছে অনেক। তবে যা আছে তারও আয়তন কম নয়। প্রায় বিরানব্বই হাজার বর্গ কিলোমিটার।

এই অরণ্যের উত্তরে বিন্ধ্য পর্বত, দক্ষিণে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদী, পূর্বে পূর্বঘাট পর্বতমালা আর পশ্চিমে অবুঝমাড় পাহাড়। ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, অন্ধ্র আর তেলেঙ্গানা, মোট পাঁচ রাজ্যের কিছু কিছু অংশ জুড়ে রয়েছে এই বনভূমি।

ওখানে সেগুন, শাল, মহুয়া ও আরও কত জানা অজানা গাছেরা মিলে জড়ো হয়ে জায়গায় জায়গায় দিনের বেলাতেও আঁধার করে রাখে। তার মধ্যে বাস করে পাহাড়ের মতো বিশাল আকৃতির বুনো মোষ, চিতা, সম্বর, চিতল হরিণ, অজগর সাপ আর পাহাড়ি ময়নার দল।

অরণ্যচর মানুষজনের মধ্যে গোন্ড উপজাতির লোকেরা আছে, মুরিয়া নামে একদল আছে, হালবা, ধুরবা ও আরও নানা জাত আছে। তারা অল্পস্বল্প চাষবাস আর বনজ সম্পদের ওপরে ভরসা করে জীবন কাটিয়ে দেয়।

ভারতবর্ষে হাজার হাজার বছর ধরে কত রাজবংশ এসেছে-গেছে, মৌর্য, গুপ্ত, শুঙ্গ, পুষ্যভূতি, পরে তুর্কি সুলতান আর মোগল বাদশারা, কিন্তু বনবাসীদের তাতে কিছু যায় আসেনি। সবার চোখের আড়ালে, অরণ্যের অন্তরালে তাদের নিজস্ব সভ্যতা বিকশিত হয়ে উঠেছে।

শেষকালে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে এল সাহেবরা। তাদের অনন্ত খিদে, শহর, বন, নদী, পাহাড় সব গিলে খেতে চায়। বনের দামি কাঠ আর মাটির নীচে খনিজ সম্পদের দিকে তাদের নজর।

আঠার শতকের শেষদিকে তারা গেল ঝাড়খণ্ডের অরণ্যে। মাটি খুঁড়ে বার করতে লাগল কয়লা, ইস্পাত ও আরও নানারকম দামি ধাতু। ছোটনাগপুর মালভূমির আদিম অরণ্য এমনতর দৌরাত্ম্যে ত্রস্ত হয়ে উঠল। তারপরে ওখানে গুটি গুটি পায়ে ঢুকল দেশি সুদখোরের দল। তারা সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুণ্ডাদের গ্রামগুলোতে গিয়ে বাসা বাধল। বনবাসীদের সর্বনাশ করার পাকা বন্দোবস্ত হল।

আদিবাসীরা অনেক দিন যাবৎ এসব সহ্য করেছিল। তারপর ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ফেটে পড়ল বিদ্রোহ। পুরো সাঁওতাল পরগনা

টলমল করে উঠল। দেশি সুদখোর আর সাহেবদের অনেকের মুণ্ড গেল টাঙির কোপে। সাহেবরা বদলা নিতে গিয়ে কামানের গোলায় উড়িয়ে দিতে লাগল বিদ্রোহীদের গ্রাম।

ব্রিটিশ জাতির অভূতপূর্ব নৃশংসতা ও কূটকৌশলের সঙ্গে বনবাসীরা পেরে উঠল না। তারা অনেকে বাসভূমি ছেড়ে পালিয়ে গেল। শহরের ঘিঞ্জি বস্তিগুলোতে হয়ে উঠল তাদের আশ্রয়।

এ ছিল ছোটনাগপুর মালভূমির ট্রাজেডি। দীর্ঘকাল যাবৎ দণ্ডকারণ্যে এমনতর উপদ্রব হয়নি। ক্লাইভ থেকে মাউন্টব্যাটেন পর্যন্ত প্রায় দুই শতকের ব্রিটিশ রাজত্বকালে ওখানে সাহেবদের বিশেষ আনাগোনা ছিল না। আসলে তখন প্রযুক্তি ততদূর উন্নত হয়নি। বুর্জোয়া শিল্পসভ্যতার ক্ষমতাও ছিল সীমিত। তাই সাহেবরা দণ্ডকারণ্য থেকে বনজ অথবা খনিজ আহরণ করতে যায়নি। কেবল সাঁওতাল পরগনা নিয়েই খুশি ছিল।

ফলত ব্রিটিশ আমলেও দণ্ডকারণ্যের অধিবাসীরা ছিল নিজেদের আদিম জীবনযাত্রায় স্থিত। সাহেবরা তাদের খোঁজ রাখত না এবং তারাও জানত না মহারানি ভিক্টোরিয়া কিংবা উইনস্টোন চার্চিলের কথা।

কালক্রমে এদেশে ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ শাসনের অবসান ঘটল। নেহরু, জিন্না, প্যাটেল প্রমুখেরা ভারতবর্ষ নামক ভূখণ্ডটি নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিলেন এবং নিজ নিজ অংশে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসলেন।

তারপর প্রাচীন দণ্ডকারণ্যের শান্তি বিঘ্নিত হল।

সরকারি লোকজন, পুলিশ আর বনরক্ষীরা বন্দুক হাতে নিয়ে ঢুকল আদিবাসীদের গ্রামে। তারা ইয়া বড় বড় গোঁফে তা দিয়ে বলল, এই শোন্! দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখন থেকে আর আগের মতো যা খুশি তাই করা চলবে না। আমাদের অনুমতি ছাড়া একটাও গাছ কেটেছিস কি সোজা ফাটকে চালান করে দোব।

বনবাসীরা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না।

স্বাধীনতা?

সেটা আবার কী?

তারা পরাধীন ছিল কবে?

খুব শিগগির তারা সেই স্বাধীনতার স্বাদ পেতে লাগল।

সাতচল্লিশ সালের পরে বনবাসীরা কেমন করে ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল সেকথা আমাদের বুঝিয়ে বলেছিলেন হিমাংশু কুমার।

এই ভদ্রলোক গান্ধিবাদী, অহিংসায় বিশ্বাসী। ভারী সজ্জন মানুষ, সবসময় সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে থাকেন। জন্ম মিরাট শহরে। দান্তেওয়াড়া শহর থেকে দশ কিলোমিটার দূরে, বনভূমির মধ্যিখানে বনবাসী চেতনা আশ্রম নামে এক সংগঠন চালাতেন। ওই সংগঠন আদিবাসীদের মধ্যে নানাবিধ কল্যাণমূলক প্রকল্পের কাজ করত।

প্রথমদিকে তাঁর সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক ভালোই ছিল। যে জঙ্গলের মধ্যে সরকারি কর্মীরা সহজে যেতে চায় না, তিনি স্বেচ্ছায় সেখানে গিয়ে জনহিতকর কাজকর্ম করছেন। দিল্লি থেকে পুরস্কার দিয়েছিল তাঁকে।

পরে সরকার থেকে অরণ্যে মাওবাদী মারার জন্য তৈরি করল প্রাইভেট মিলিশিয়া। তার নাম সালওয়া জুডুম। আমাদের এখানে সাতের দশকে যেমন প্রতিরোধ বাহিনী বানিয়েছিল, সালওয়া জুডুম অনেকটা সেইরকম। আদিবাসী তরুণ তরুণীদের একটা অংশ চাকরির লোভে তাতে ভিড়ল।

সালওয়া জুডুম গোন্ড ভাষার শব্দ। তার মানে শান্তি অভিযান। সরকার বোঝাতে চাইছিল, মাওবাদীরা জঙ্গলকে অশান্ত করে তুলেছে। তাই অমন শান্তি অভিযানের সূত্রপাত।

দু'হাজার পাঁচ সাল থেকে পুলিশ, আধা সেনা আর সালওয়া জুডুমের গুন্ডারা বেপরোয়া খুন-জখম, লুটপাট, নারীর ইজ্জতহানি ইত্যাদি শুরু করল। হিমাংশু কুমার এসব সহ্য করার পাত্র নন। তিনি তেজি ভাষায় প্রতিবাদ জানালেন। পুলিশ ক্ষেপে গিয়ে বলল, এই ব্যাটাও নির্ঘাৎ মাওবাদী। না হলে বনবাসীদের প্রতি অত দরদ কীসের।

হিমাংশু কুমার বছর কয়েক আগে এসেছিলেন কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলের এক সভায়। সেখানে তিনি বলেন,

দণ্ডকারণ্যের অধিবাসীরা আগে পরাধীন ছিল না। ইংরেজরা তাদের দেশে বিশেষ উপদ্রব করতে পারেনি। সুতরাং সাতচল্লিশ সালের পরে সরকারি লোকেরা যখন তাদের গ্রামে গিয়ে বলল, ওরে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন থেকে আমাদের হুকুম মেনে চলবি, তখন তারা বুঝতেই পারল না কথাটার মানে কী।

কিছুদিনের মধ্যেই আদিবাসীরা দেখতে পেল বনের মধ্যে কয়েক মাইল অন্তর বসছে থানা আর ফরেস্ট গার্ডের অফিস। তারপর সরকারি লোকেরা হয়ে উঠল সর্বময় কর্তা।

ওরা বুনো মোষ, অজগর কিংবা চিতার চেয়েও ভয়ংকর। একবার ধরলে আর রক্ষা নেই। সোজা জেলে ঢুকিয়ে দেবে। বনবাসীরা আইন-কানুন আদালত বোঝে না, শামলা মাথায় জজ অথবা কালো কোট পরা উকিলবাবুদের রীতিমতো ডরায়। আদালতের ভুলভুলাইয়া পার হয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসা তাদের সাধ্যের অতীত। একবার পুলিশে ধরলে তারা জীবনভর জেলে পচে মরে।

বনের মধ্যে ইস্কুলগুলো অনেক দূরে দূরে। ছেলেমেয়েরা পায়ে হেঁটে দীর্ঘ বিপদসংকুল পথ পেরিয়ে ইস্কুলে যায়। হাসপাতাল এত দূরে যে সেখানে নিয়ে যেতে যেতে রোগীর মারা যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। কিন্তু চারদিকে থানাপুলিশের অভাব নেই।

হয়তো বনবাসীদের কারও একমাত্র কিশোর ছেলেটি সাপের কামড়ে অথবা জলে ডুবে মারা গেছে, খবর পেলেই সেই বাড়িতে হানা দেয় থানার দারোগা। সঙ্গে গুটিকতক কনস্টেবল। পুত্রহারা বাবাকে ওই শোকের সময় দারোগাবাবু আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের জন্য মদ আর মুরগির ব্যবস্থা করতে হয়। এর অন্যথা হলে বিপদ।

আদিবাসীদের জীবনকে আগাগোড়া দুঃস্বপ্নে পরিণত করার জন্য পুলিশ-পেয়াদারা তো আছেই, তার সঙ্গে আছে উন্নয়ন। সেই নেহরুর

আমল থেকে কুমারী অরণ্যে শুরু হয়েছে উন্নয়নের দাপট।

অরণ্যে কীভাবে উন্নয়ন হবে তা নিয়ে কেউ কখনও অরণ্যবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করেনি। ওই মুখ্যু ব্যাটারা আবার জানে কী! উন্নয়নের পরিকল্পনা করে দিল্লির বাবুরা, যাদের নামের পাশের লম্বা চওড়া ডিগ্রি, সাহেবদের দেওয়া সার্টিফিকেট।

সেই পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য কোট-প্যান্ট পরা হোমরা চোমরা আমলার দল সাদা অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে চড়ে ঢোকে অরণ্যে। গাড়ির আগায় পেতলের অশোকস্তম্ভ লাগানো। গাড়ি থেকে নেমে ইঞ্জিনিয়ারবাবুরা, সাহেব বিশেষজ্ঞরা সব গটমট গটমট করে চারদিক ঘুরে দেখে। নানারকম মাপজোপ করে। তারপর তৈরি হয় বিশাল বিশাল নদীবাঁধ।

বাঁধগুলো একে একে গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদীগুলোর গলা টিপে ধরে। তখন নদীর জলে ভেসে যায় গরিবগুর্বোদের গ্রাম।

এমনি করে শত শত গ্রাম জলের তলায় গেছে। গাছ কেটে, পশুপাখিকে হত্যা করে, বনবাসী মানুষের জীবিকা কেড়ে নিয়ে তৈরি হয়েছে বড় বড় নগরী। মাটি ফুঁড়ে মাথা তুলেছে মিশকালো ধোঁয়াওঠা ইন্ডাস্ট্রি। মাটির বুক চিরে মূল্যবান আকরিক তুলেছে। ওই সব জায়গায় কর্মসংস্থানের জন্য ভিড় জমিয়েছে নানা রাজ্যের সস্তা শ্রমিক আর কালামুখো দেশি সাহেবের দল।

দণ্ডকারণ্যে খনিজের ভাঁড়ার অফুরন্ত। আজও ওখানকার মাটির নীচে চাপা পড়ে আছে বক্সাইট, ডলোমাইট ও আরও কতকিছু। পঞ্চাশ-ষাট বছরেও সেসব শেষ হওয়ার নাম নেই। ওই সম্পদই স্থানীয় মানুষের বিপদের কারণ।

মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো দিল্লির পলিটিশিয়ান আর আমলাদের বলেছে, জঙ্গল খালি করে দাও, আমরা মিনারেলস তুলব। মোটা বখশিসের লোভে পেটমোটা দিশি বাবুরাও তৈরি, অমনি পাঠিয়ে দিয়েছে পুলিশ আর আধা সেনার পল্টন। বনবাসীদের বলছে, ভাগো হিঁয়াসে।

বনের মানুষজন দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে দিল্লির শাসকদের নানা অত্যাচার সহ্য করেছে, কিন্তু যখন দেখল এবার জন্মস্থান থেকে একেবারে উচ্ছেদ হওয়ার উপক্রম, তখন রুখে দাঁড়াল।

তারা এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানে উচ্ছেদ হওয়া মানে মৃত্যু কিংবা অভাবের গ্রাসে তলিয়ে যাওয়া। তাই জঙ্গলের মানুষ এখন জলপাই রঙা পোশাক পরে রাইফেল হাতে বহুজাতিকদের উন্নয়নের মোকাবিলা করে।

কিন্তু খদ্দর পরা ভোটবাবুরা কি এত সহজে ছাড়ে? ওরা ইতিমধ্যে বড় বড় কোম্পানির থেকে মোটা টাকা খেয়ে বসে আছে, গ্রাম খালি করতেই হবে। তাই এখন বস্তার জেলার মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় আটান্ন হাজার সেন্ট্রাল প্যারা মিলিটারি ফোর্স মোতায়েন করা আছে। তাদের সহায়তা করে পঞ্চাশ হাজার ছত্তিশগড় স্পেশ্যাল আর্মড পুলিশ। আদিবাসীদের একাংশকে নিয়ে গঠিত স্পেশ্যাল পুলিশ অফিসাররা আছে। নানা ইনটেলিজেন্স এজেন্সিও সর্বক্ষণ গন্ধ শুঁকে শুঁকে খুঁজে বার করতে চাইছে, এই অরণ্যে কে বিদ্রোহী আর কেই বা শাসকদের অনুগত।

জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে কিছুদূর অন্তর আধা সেনার ক্যাম্প। তার চারপাশে গোল করে পাকানো কাঁটাতারের বেড়া, বেড়ার গায়ে আবার খালি মদের বোতল ঝোলানো। আধা সেনার কনভয় যাতে দ্রুত যাতায়াত করতে পারে সেজন্য জঙ্গলের মধ্যিখান দিয়ে পিচ মোড়া রাস্তা। জংলা ইউনিফর্ম, ইনস্যাস রাইফেল, নাইট ভিশন গগলস, মাইন প্রতিরোধী গাড়ি, আধা সেনার সাজ-সরঞ্জামের অভাব নেই। অনেক টাকা দিয়ে ইজরায়েল থেকে ওসব কিনে এনেছে। বিদ্রোহীদের সমূলে বিনাশ করার প্রচেষ্টা।

চাষিরাও ছাড়ার পাত্র নয়। তারা গেরিলা কায়দায় রাষ্ট্রের বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে, মৃত সৈনিকদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চম্পট দেয়, পুলিশ অথবা আধা সেনা যাতে গ্রামে ঢুকতে না পারে সেজন্য ল্যান্ডমাইন পেতে রাখে।

জঙ্গলের মধ্যে দু'পক্ষের যুদ্ধ তীব্রতর হয়েছে গত এক দশক যাবৎ। আমি দু'হাজার চোদ্দ আর ষোল সালে দু'বার এপিডিআরের টিমের সঙ্গে গিয়ে দেখে এসেছি। এই নিয়ে আমার তৃতীয়বার যাওয়া হবে।

৩

আমরা প্রথমে যাচ্ছি জগদলপুরে।

সেখান থেকে সড়কপথে ওড়িশা-ছত্তিশগড় সীমান্তে যাওয়ার কথা। ওখানে নগরনার বলে একটা জায়গায় সরকারি ইস্পাত প্রকল্পের কাজ চলছে। বর্তমান শতকের গোড়ায় ন্যাশনাল মিনারেলস ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনএমডিসি) স্থানীয় অনেকগুলো গ্রাম খালি করে দিয়ে ফাঁকা জায়গায় কারখানা বানিয়েছিল। মোট দু'দফায় জমি নিয়েছে। কিন্তু ঠিকমতো ক্ষতিপূরণ দেয়নি। এখন বলছে, আরও জমি চাই। গ্রামবাসীরা বলছে, দেব না। তার ওপরে শোনা যাচ্ছে, এনএমডিসি-র কারখানা বেসরকারি হাতে যাবে। সব মিলিয়ে এলাকায় ঘোর অসন্তোষ। আমরা প্রথমে তাদের কথা শুনতে যাব।

তারপরে যাব দান্তেওয়াড়ায়। শুনেছি, ওখানে মাওবাদী দমনে যে সিআরপি জওয়ানদের মোতায়েন করা আছে, স্থানীয় স্কুলের মেয়েরা তাদের হাতে রাখি পরিয়ে দিতে গিয়েছিল। সেই সুযোগে জওয়ানরা ষোলটি মেয়ের শ্লীলতাহানি করেছে। মেয়েগুলো ক্লাস এইট-নাইনে পড়ত, অর্থাৎ রামায়ণে কথিত সেই কুমারী অবজার সমবয়সী।

হয়তো সুদূর অতীতে দণ্ডকারণ্যের কোনও অত্যাচারী রাজা সত্যিই এক অপাপবিদ্ধ কুমারীর সম্ভ্রম নষ্ট করেছিল। ঘটনাচক্রে তার কিছুদিন পরে অরণ্যে দাবানল লেগে রাজপ্রাসাদ ধ্বংস হয়ে যায়, রাজাও মারা পড়ে। লোকে ভেবেছিল, অবমানিতা কন্যার পিতার অভিশাপে অমন হয়েছে। সেই থেকে সৃষ্টি হয়েছিল পুরাণকাহিনি। তার পর থেকে হাজার হাজার বছর ধরে সেই মিথ লোকের মুখে মুখে ঘোরে, অত্যাচারী রাজা এক কিশোরীর সম্মানহানি করার পরে কেমন শাস্তি পেয়েছিল।

এমনিতে আমাদের দেশে মেয়েদের সম্মান নষ্টের কথা সবাই গোপন রাখে। আরে চুপ চুপ, কেউ যেন শুনতে না পায়। শুনলে হয়তো বলবে মেয়েটারই দোষ, সে ওখানে গিয়েছিল কেন? অমন পোশাক পরেছিল কেন?

পুলিশ-প্রশাসনও দান্তেওয়াড়ার স্কুলের ঘটনা ধামাচাপা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তার পরেও অনেকে জেনে গেল।

জঙ্গলের মধ্যেকার গ্রামগুলোতে সকলে ফিসফাস বলাবলি করত, জওয়ানগুলো কেমন শয়তান দেখেছ! মেয়েগুলো ওদের দাদা ভেবে রাখি পরাতে গেল, তাদের গায়েও কিনা হাত দিয়েছে! সেই ফিসফিসানি কোনওভাবে শুনতে পেয়েছিলেন সোনি সোরি। তিনি সাহসী মানবাধিকারকর্মী।

সোনিজি খবর পেয়েই যোগাযোগ করলেন ছাত্রীদের সঙ্গে। তাদের বোঝালেন, প্রতিবাদ না করলে জওয়ানরা আরও পেয়ে বসবে। পুলিশে এফআইআর হল। সিআরপি সঙ্গে সঙ্গে দু'জন জওয়ানকে সাসপেন্ড করে বলল, ওই তো অপরাধীরা শাস্তি পেয়েছে। আর এই নিয়ে যেন কেউ কথা না বলে।

কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজে চাপা পড়েনি। সোনি সোরি এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে দোষীরা সকলে শাস্তি পায়।

আমরা সেই স্কুলে একবার যাব। গিয়ে শুনব, ওখানকার মানুষ, স্কুল কর্তৃপক্ষ কী বলছে।

সব শেষে যাব বরকাপাল নামে এক জায়গায়। ওই নামটা ছত্তিশগড়ের টুরিস্ট গাইডে পাওয়া যাবে না। কিন্তু গুগলে দেখে নিয়েছি, গ্রামটি সুকমা জেলার কোটনা তহশিলের অন্তর্গত একটি গ্রামের নাম বরকাপাল। খুব ছোট্ট গ্রাম। মোটে নব্বইটি পরিবারের বাস। গ্রামের লোকসংখ্যা সর্বসাকুল্যে সাড়ে তিনশ।

ওইসব এলাকায় বহুদিন ধরে মাওবাদীদের রাজত্ব। তাদের মারতে বরকাপাল গ্রামে বসিয়েছে সিআরপি-র শক্তপোক্ত ক্যাম্প। গ্রাম থেকে অল্প দূরে পিচবাঁধানো চওড়া রাস্তাও তৈরি হচ্ছে। যারা রাস্তা বানাচ্ছে তাদের মনে ভারী ভয়। সিআরপি যাতে জঙ্গলের মধ্যে দ্রুত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছে যায়, মাওবাদীদের খুঁজে বার করতে পারে, সেজন্যই তো রাস্তা তৈরি হচ্ছে। মাওবাদীরা যদি টের পেয়ে অ্যাটাক করে!

গত পঁচিশে এপ্রিল সিআরপি-র এক টহলদার বাহিনী গিয়েছিল রাস্তা নির্মাণকারীদের সাহস দিতে, কিচ্ছু ভয় নেই, মাওবাদীরা একবার এই তল্লাটে আসুক দেখি! আমরা রেডি আছি।

কিন্তু মাও সে তুং শিখিয়েছেন, শত্রু যখন রেডি থাকে, তখন তার ধারেকাছে ঘেঁষতে নেই। সে যখন অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকে, তখনই আক্রমণ করতে হয়।

সিআরপি সেই কনস্ট্রাকশন সাইটে দুপুর বেলা খেতে বসেছিল। এমন সময় দূর থেকে বনের পথ ধরে দল বেঁধে আসছিল গ্রামের একদল মেয়ে। তাদের মাথায় কাঠের বোঝা। মেয়েরা জঙ্গল থেকে রোজই কাঠ সংগ্রহ করতে যায়, ওরকম বোঝা মাথায় নিয়েই ফেরে। তাই সন্দেহ করার কিছু ছিল না।

সেদিন সিআরপি-র কাছাকাছি এসেই মেয়েরা মাথা থেকে ঝপাঝপ ফেলে দিল কাঠের বোঝা, তার বদলে হাতে উঠে এল রাইফেল, অতঃপর দমাদ্দম গুলি। সিআরপি খাবার ছেড়ে ওঠার সময়টুকুও পায়নি।

কাঠের বোঝার মধ্যেই রাইফেল লুকানো ছিল।

মেয়েদের হাতে গুলি খেয়ে পঁচিশ জন জওয়ান স্পট ডেড। আহত আরও অনেকে। পরে দিল্লিতে সিআরপি-র কর্তারা মানরক্ষার জন্য বললেন, আমরাও ছাড়িনি, দেদার ঢিসুম ঢিসুম চালিয়েছি, ঝাড়া তিনটি ঘণ্টা ধরে লড়াই করেছি, মাওবাদীরা পালে পালে মারা পড়েছে। কিন্তু সেকথার পক্ষে কোনও প্রমাণ দেখাতে পারলেন না।

তাতে মন্ত্রী-সান্ত্রীদের মহা বেইজ্জতি হল। শিল্পপতিরা তাঁদের চোখ পাকিয়ে বলল, ব্যাপারটা কী? এত করেও মাওবাদীদের বাগে আনা যাচ্ছে না কেন?

এরকম ক্ষেত্রে যা হয়, এরপর তাই হল। সিআরপি ভাবল আশপাশের গ্রামে যত লোক আছে সবক'টা মাওবাদী। না হলে বিদ্রোহীরা খবর পেল কী করে কখন সিআরপি খেতে বসেছে? ওরাই নিশ্চয় খবর দিয়েছে।

এই ভেবে তারা বরকাপাল গ্রাম থেকে প্রায় আশি জনকে তুলে নিয়ে গেল। তারা আটকে রইল কারা কুঠুরিতে।

আট-দশদিন বাদে তাদের মধ্যে জনা চল্লিশেক লোককে কোর্টে তুলল। তাদের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি অভিযোগ, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র রাখা, বেআইনি জমায়েত, খুন ও আরও কত কিছু। কিন্তু তাদের বাড়ির লোকজন পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাল, যতই হোক, তারা তো বেঁচে আছে। হয়তো দীর্ঘ সময়, এমনকী অনেককে সারা জীবনই জেলে কাটাতে হবে। তবু তারা বেঁচে তো আছে।

কিন্তু বাকিরা কোথায়?

তাদের খোঁজ নেই। তারা কি জীবিত? নাকি মারতে মারতে মেরেই ফেলেছে একেবারে? তাদের আত্মীয়-বন্ধুরা কেউ কিছু জানে না। সম্ভবত অরণ্যের মধ্যে কোথাও আছে গণকবর, সেখানে তাদের দেহাবশেষ মাটি চাপা দিয়েছে।

বিপ্লবীদের সমর্থক ও সহায়কদের নিখোঁজ করে দেওয়া বিপ্লব দমনের খুব চালু কৌশল। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে অমন হয়ে আসছে। ইন্দোনেশিয়া, চিলি সহ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশে অমন করেছে। বরকাপালের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার।

আমরা যাচ্ছি ওই হারিয়ে যাওয়াদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে। প্রথমে বরকাপাল গ্রামে গিয়ে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর সঙ্গে কথা বলব। তারপর প্রশাসনের কাছে জানতে চাইব, জলজ্যান্ত লোকগুলো কি বাতাসে মিলিয়ে গেল?

৪

হাওড়া থেকে রেলপথে দু'ভাবে জগদলপুরে পৌঁছানো যায়। একটা ট্রেনে চাপলে পৌঁছে দেয় বিশাখাপত্তনম। সেখান থেকে আর একটা ট্রেনে জগদলপুর। অন্য একটা ট্রেন যায় রায়পুর অবধি। সেখান থেকে বাসে জগদলপুর যাওয়া যায়।

আমরা দেখলাম বিশাখাপত্তনমের ট্রেন ধরা বেশ ঝুঁকির ব্যাপার। যদি লেট করে তো জগদলপুর যাওয়ার ট্রেন মিস করব। ওই ট্রেন দিনে একটাই চলে। মিস করা মানে পুরো একটা দিন ঠায় বসে থাকতে হবে বিশাখাপত্তনমে।

দশই আগস্ট। রাত এগারটা

হাওড়া থেকে রায়পুরগামী ট্রেন ছাড়ল। জানলা দিয়ে কিছু দেখা যায় না। গভীর অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কু ঝিক ঝিক ট্রেন যাচ্ছে।

এগারই আগস্ট, ভোর সাড়ে ছ'টা

ট্রেন এইমাত্র রৌরকেল্লা স্টেশন ছেড়ে গেল। বনের মধ্যে দিয়ে ট্রেন চলেছে। শেষ বর্ষার জল পেয়ে বনভূমি স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ। মধ্যে মধ্যে চাষের খেত। তার সর্বত্র খানাখন্দে ভরা, সেখানে বৃষ্টির জল জমে আছে।

সকাল আটটায় ট্রেন ঝাড়সুগুদা স্টেশনে। আমরা এখনও ওড়িশায়। এখানে নতুন কয়লাখনির খোঁজ মিলেছে। বনের শ্যামলিমা মুছে গিয়ে জায়গাটা ধূসরবর্ণ। খনির যন্ত্রপাতিগুলো ট্রেনলাইনের খানিক দূরে দাঁড় করানো।

সাড়ে আটটা। ট্রেন বেলপাহাড় স্টেশনে। তারপর ডোগরা। ওই হল ওড়িশা-ছত্তিশগড় বর্ডার। আমাদের কামরায় এক প্যান্ট শার্ট পরা ভদ্রলোক উঠলেন, রায়পুরে যাচ্ছেন। পেশায় অ্যাকাউন্ট্যান্ট। নাম, প্রকাশ আগরওয়াল। আদতে হরিয়ানার লোক, এখন ওড়িশায় থাকেন। দেখতে দেখতে দিব্যি আলাপ জমে গেল। কথা প্রসঙ্গে বললেন, জিএসটি ব্যাপারটা বিশেষ সুবিধের নয় মশায়, দেখবেন বড় বড় বিজনেসম্যানরা বেজায় ট্যাক্স ফাঁকি দেবে। আম আদমির জিএসটিতে কোনও লাভ নেই। ওড়িশার কয়লাখনিগুলোর কথা জিজ্ঞাসা করতে বললেন, ওখানে তো অনেক গ্রাম খালি করে দিয়েছে। তমালিয়া, গর্জনবাগ, আরও কত গ্রাম ছিল। মাটির নীচে কয়লা আছে জানতে পেরে স্থানীয় লোকজনকে ঘরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। যাদের কাছে বাড়ির দলিল ছিল তারা তবু ক্ষতিপূরণ বাবদ যাহোক কিছু পেয়েছিল। অনেকেরই দলিল ছিল না। এমনিই একখণ্ড জমিতে মাটির ঘরে সাতপুরুষ ধরে বাস করত। তাদের ভাগ্যে লবডংকা।

বেলা বাড়ছে। ট্রেন যত রায়পুরের নিকটবর্তী হচ্ছে, তত বদলে যাচ্ছে চারপাশের ছবি। একটা মাঝারি স্টেশন পেরনোর পরে দেখি, কিছু দূরে এক বিশাল কারখানা। প্রকাশ আগরওয়াল বললেন, ওই দেখুন একটা স্টিল প্ল্যান্ট। কারখানা চালু রাখার জন্য কাছেই বিদ্যুৎকেন্দ্র বানিয়েছে।

ট্রেন মাঝে মাঝে ছোট ছোট স্টেশনে থামছে। স্থানীয় লোকজন উঠছে নামছে। বারোদুয়ার-চম্পা স্টেশন থেকে একটি মেয়ে উঠল, বছর বাইশ-তেইশ, সালোয়ার-কামিজ পরা, হাতে বইখাতা। তার সঙ্গে আলাপ করলাম। সে বলল, আমার নাম পুনম শুকদেব। বিলাসপুর ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। সাবজেক্ট, মাইক্রোবায়োলজি। টিউশন ফি ও অন্যান্য খরচ বাবদ বছরে আশি হাজার টাকা দিতে হয়।

মাঝে একবার গুমগুম শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি, আমাদের ট্রেন ব্রিজের ওপর দিয়ে একটা ছোট্ট নদী পেরচ্ছে। দূরে ছোট ছোট লাল ইটের বাড়ি, মাথায় অ্যাসবেস্টসের চাল। তার ওপরে আবার খোলার ছাউনি। গরম থেকে বাঁচবার জন্য ওইরকম বন্দোবস্ত। পৌনে বারোটায় ট্রেন পৌঁছল বিলাসপুরে। পুনম নেমে গেল। খানিক বাদে সুনীলের ফোন, দাদা আপনারা কদ্দুর? সুনীল দিল্লির ছেলে। গত ডিসেম্বরে আমাদের সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরে গিয়েছিল। সে ট্রেড ইউনিয়ন করে আবার মানবাধিকার সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত। এবার ছত্তিশগড়ে আমাদের সঙ্গী হয়েছে।

বেলা একটা বেজে চল্লিশ মিনিট

ট্রেন রায়পুরে পৌঁছল। স্টেশনে সুনীল দাঁড়িয়ে, গৌতম নাভালকা আছেন, তাঁর পাশে লম্বা চওড়া চেহারা, পাগড়ি মাথায় আরও দু'জন দাঁড়িয়ে। পাঞ্জাব থেকে এসেছেন। তাঁরা আমাদের সঙ্গে মালকানগিরিতেও গিয়েছিলেন।

জগদলপুরের বাস ছাড়বে রাত দশটায়। এখন বিশ্রামের পর্ব। ওয়েটিংরুমে মালপত্র রেখে বাইরে হোটেলে মধ্যাহ্নভোজ। ভাত-ডাল-সবজি কুড়ি টাকা। আমি নামমাত্র মুখে দিলাম। পেটের অবস্থা ভালো নয়, বেশি খেতে গিয়ে কি বিপদে পড়ব!

দুপুরে ওয়েটিংরুমে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। বিকালে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল শ্রেয়া। রায়পুরেই তার বাড়ি। এখানকার কোনও একটা স্কুলে পড়ায়। ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার সঙ্গে যুক্ত। গতবারে আমাদের সঙ্গে জঙ্গলে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংয়ে গিয়েছিল। সেখানেই আলাপ। শ্রেয়ার হাতে হেলমেট। তার মানে বাইকে চড়ে এসেছে।

সে কথায় কথায় বলল, দণ্ডকারণ্যের পরিস্থিতি এখন খুব গরম। সিআরপি গ্রামে গ্রামে ঢুকে বেধড়ক মারধর করছে। মেয়েদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

সন্ধেবেলায় গৌতম নাভালকা আমাদের জন্য বাসের আটটা টিকিট কেটে নিয়ে এলেন। বাস ছাড়ল রাত দশটায়। এসি বাস। কাচের জানলার ওপরে ভারী পর্দা টানা। পথে একবার পাঞ্জাবি ধাবার সামনে থেমেছিল। জঙ্গলের মধ্যে হলে কি হবে, ঝলমলে আলো দিয়ে বেশ সাজানো জায়গাটা। সেখানে মেলে রুটি আর তড়কা। ধাবার সামনে আরও অনেক বাস দাঁড়িয়ে। অনেক যাত্রীর ভিড়।

৫

১২ আগস্ট। শনিবার। ভোর সাড়ে পাঁচটা

একটু আগে বাস পৌঁছল জগদলপুরে। ছোট্ট শহর। তার অদূরেই বনাঞ্চল। স্থানীয় লোকে বলে, এখানে রামায়ণের বাল্মীকি মুনির আশ্রম ছিল।

আমরা বাসস্ট্যান্ড থেকে যাচ্ছি রেল স্টেশনে। মিনিট পনেরর হাঁটা পথ। বিশাখাপত্তনম থেকে ট্রেনে দাক্ষিণাত্যের মানবাধিকার কর্মীরা আসছেন। তাঁদের স্টেশনে রিসিভ করব।

মোট ছ'জন এলেন। অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক আর তামিলনাড়ু থেকে এসেছেন। সব মিলিয়ে আমরা হলাম আঠার জন। এবার গন্তব্য, গেস্ট হাউস। ওখান থেকে অরণ্যের পথে যাত্রা শুরু হবে।

রেখা গেস্ট হাউস নামে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে কয়েক ঘণ্টার জন্য আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা। আমরা সেখানে জিনিসপত্র রেখে বাইরে খেতে গেলাম। পথের পাশে ছোট্ট দোকান। ইডলি দিয়ে প্রাতঃরাশ হল। গেস্ট হাউসে ফিরছি এমন সময় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু। সঙ্গে ছাতা নেই। সবাই একেবারে কাকভেজা।

গেস্ট হাউসে ফিরে দেখি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন সোনি সোরি আর বেলা ভাটিয়া।

সোনিজি বস্তার জেলায় এক স্কুলে শিক্ষকতা করেন। রোগা-পাতলা চেহারার মানুষ, বয়স চল্লিশের কোঠার শুরুর দিকে। তাঁর মনের জোর সাংঘাতিক। মাওবাদী মারার বিরোধিতা করতে গিয়ে বহুদিন যাবৎ প্রশাসনের চক্ষুশূল। অপছন্দের লোকেদের বিরুদ্ধে পুলিশ যা যা করে, যথা কুৎসা, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো, লক আপে অত্যাচার ইত্যাদি সবই তাঁর ওপরে করেছে। তিনি বলেন, আমার ওপরে যত অত্যাচার হবে আমি তত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠব।

বেলা ভাটিয়া গবেষক, একসময় অধ্যাপনাও করতেন। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে দণ্ডকারণ্যে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের যুদ্ধ অভিযান নিয়ে পত্রপত্রিকায় লিখে চলেছেন। কোথাও মানবাধিকার লংঘন হয়েছে শুনলে যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টাও করেন। পুলিশ তাঁর পিছনে গুন্ডা লেলিয়ে দিয়েছিল। বেলা ভাটিয়া তাতে ভয় পাওয়ার পাত্রী নন।

সোনি সোরি এবং বেলা ভাটিয়া গেস্ট হাউসে বসে আমাদের ব্রিফ করলেন, দান্তেওয়াড়ার স্কুলে আদিবাসী ছাত্রীদের সঙ্গে ঠিক কী ঘটেছিল। নগরনার অঞ্চলে এনএমডিসি-র প্রকল্প নিয়ে গ্রামবাসীরা কেন ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

গৌতম নাভালকা জিজ্ঞাসা করলেন, নগরনার প্রকল্পে যারা জমি দিয়েছিল, তারা কি এখনও কারখানারই আশপাশে থাক্কে বেলা ভাটিয়া বললেন, হ্যাঁ, ওহ আশপাশকা গাঁও কি হ্যায়। আট গাঁও কি হ্যায়। গৌতম বললেন, হমনে শুনা, আভি গভর্নমেন্ট নিজীকরণ করনে যা রহা হ্যায়। ওহাঁ তো আউর কুছ গড়বড়ি চলা থা, না?

নিজীকরণ কথাটির অর্থ প্রাইভেটাইজেশন, বেসরকারিকরণ। গৌতম নাভালকার ইচ্ছা, বেসরকারিকরণের নামে যে অনাচার চলছে সে সম্পর্কে বিশদে জানবেন।

কিন্তু নগরনারে পৌঁছে অত খোঁজখবর নেওয়ার সময় পাওয়া যাবে ক্কি সোনি সোরি বললেন, ওখানে যেতে তিন ঘণ্টা লাগবে।

প্রশ্ন হল, ওখান থেকেই কি আমরা যাব বরকাপাল গ্রামে?

কেউ কেউ সেইরকমই বলছিল কিন্তু গৌতম তাতে নারাজ। মেরে কো ইতনা হিম্মত নেহি কি নগরনার করকে আনে কা বাদ তিন ঘণ্টা গাড়ি মে বৈঠ কর সুকমা যায়ে। আমরা প্রত্যেকে ক্লান্ত। কাল রাতে আমাদের ঘুম হয়নি। এখন আমরা রাস্তার মধ্যে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি তো এভরিথিং উইল কোলাপস। লেট আস কাম ব্যাক, স্লিপ অ্যান্ড লিভ আর্লি মরনিং।

তখন সবাই মিলে ঠিক করলাম, আজ আর বরকাপালে গিয়ে কাজ নেই, বরং নগরনার থেকে পালমের গ্রামে ঘুরে আসব। ওখানে সিআরপি জওয়ানরা স্কুলছাত্রীদের শ্লীলতাহানি করেছিল। সোনিজি সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললেন, ছোটা ছোটা বাচ্চে, সোলা ইয়া সাতোয়া হ্যায়, ওহ সবকা উপর পুলিশ আউর প্রশাসন গলত কর রহা হ্যায়। এক তো একত্রিশ তারিখ কো প্রোগ্রাম হুয়া, সিআরপিএফ কো রাখি বনায়া গিয়া, ওহ হামারা আদিবাসী কালচার মে নেহি বানতে, এক জবরদস্তি ড্রামা কিয়া। ফির উসকে বাদ বচ্চেঁ কে সাথ ইয়ে চর্চা হুয়া, হমলোগ কো কিসি তরহ সে পতা চলা, সাত তারিখ কো এফআইআর দরজ কিয়া।

সোনি সোরি বলতে চাইছেন, গত একত্রিশে জুলাই জওয়ানরা যেভাবে স্কুলের মধ্যে রাখিবন্ধন উৎসব করেছিল, তা বেআইনি। কারণ তারা পুলিশ-প্রশাসনের অনুমতি নেয়নি। তার চেয়েও বড় কথা, আদিবাসী সংস্কৃতিতে রাখিবন্ধন উৎসব নেই। সুতরাং আদিবাসী বালিকারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জওয়ানদের হাতে রাখি বেঁধে দিতে গিয়েছিল, একথা ঠিক নয়। আসলে রাখিবন্ধন উৎসবের নামে সিআরপি-র বড় অফিসাররা নাটক সাজিয়েছিলেন। তাঁরা প্রমাণ করতে চাইছিলেন, আদিবাসীদের মধ্যে সিআরপি খুব জনপ্রিয়। কারণ তারা নকশালদের হাত থেকে ওদের রক্ষা করছে। গ্রামের মেয়েরা জওয়ানদের দাদা মনে করে হাতে রাখি পরিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু সিআরপি জওয়ানরা মেয়েদের সম্মান করার শিক্ষা পায়নি। বরং উল্টো শিক্ষাই পেয়েছে। তাই কিশোরীরা নিগৃহীত হল। এর দায় জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারও এড়াতে পারেন না। তাঁদের অনুমতি ছাড়া জওয়ানরা স্কুলে অনুষ্ঠান করতে সাহস পায় কী করে?

ইতিমধ্যে গেস্ট হাউসের সামনে তিনটি স্করপিও গাড়ি হাজির। স্থানীয় মানবাধিকারকর্মীরা ভাড়া করেছেন। সোনি সোরি বললেন, এখনই রওনা হলে নগরনার আর পালমের, দু'টো জায়গাই ঘুরে আসতে পারবেন। আমরা বেলা ন'টা নাগাদ রওনা হলাম।

দুপুর পৌনে একটা

আমরা নগরনার স্টিল প্ল্যান্টে। বিশাল এলাকা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, তার মধ্যে কারখানা, প্রবেশপথে কালো পাথরের ওপরে উজ্জ্বল সোনালি রংয়ে দেবনাগরী হরফে লেখা, এনএমডিসি লিমিটেড। যাঁরা প্রকল্পের উদ্বোধন করতে এসেছিলেন তাঁদের নামগুলোও রয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী রমন সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান, বলিরাম কাশ্যপ, জিতিন প্রসাদ।

ইউনিয়নের নেতারা আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন কনফারেন্স রুমে। ঘসা কাচে মোড়া ঘর। দেওয়ালে প্রণব মুখার্জি আর নরেন্দ্র মোদির হাসিমুখের ছবি। আমরা কনফারেন্স টেবিল ঘিরে বসলাম। ইউনিয়নের দু'জনও বসলেন। একজন রোগা, চশমা পরা। অপরজন স্বাস্থ্যবান। চশমা পরা ভদ্রলোক বললেন, হমারে ইহাঁ দো ইউনিয়ন হ্যায়। এআইটিইউসি সে হ্যায় আউর ইনটাক সে হ্যায়। ম্যয় মহেন্দ্র জৈন হুঁ, আউর

ইয়ে হ্যায় শান্তারাম শেঠিয়া, দোনো হি এআইটিইউসি কা। হম তো জনকারি নেহি থা কি আপ আয়েঙ্গে। গৌতম মুচকি হেসে বললেন, হম তো আচানক হি আতে হ্যায়।

মহেন্দ্র বললেন, আমাদের এখানে এসসি, এসটি এবং বিভিন্ন জনজাতির একটা সংগঠন আছে। তার প্রেসিডেন্ট মহেশ্বর নাগ। সম্পাদক রমেশ কাশ্যপ।

রমেশও কনফারেন্স রুমে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করলেন।

মহেন্দ্র বলতে লাগলেন, এখানে যারা কর্মচারী আছে, সবাই ল্যান্ড লুজারস। হামারা জমিন দো হাজার এক সে দো হাজার দশ কে বিচ মে লে গয়ি হ্যায়। দু'হাজার এক সালে যাদের জমি নিয়েছিল, শুধু তারা চাকরি পেয়েছে। দো হাজার এক মে তিনশ তিন কিষানোঁ কো জমি লে গয়ি। সব মিলিয়ে জমির পরিমাণ ছিল এগারশ একর। যে তিনশ তিন জনের জমি নিল, তাদের মধ্যে একশ লোককে কিছুদিনের মধ্যে চাকরি দিয়ে দিল। তারা দু'হাজার দুই সালে চাকরি পেয়েছিল। বাকি দু'শ তিন জনের চাকরি অত সহজে হয়নি। এদিকে জমি হারিয়ে তাদের বিরাট ক্ষতি হচ্ছিল। আমরা ক্ষতিপূরণ দাবি করলাম। আন্দোলন হল। প্রশাসনকে জিজ্ঞাসা করলাম, যব তুম জমিন এক সাথ লেতে হো, তব নোকরি আলগ আলগ দেনে কা ইয়ে কৌন সা প্রক্রিয়া হ্যায়?

দু'হাজার ছয় থেকে নয় সাল পর্যন্ত লাগাতার আন্দোলনের পরে বাকিরা চাকরি পেল। তাতেও দেখা গেল, অনেক বৈষম্য হয়েছে। যার যা যোগ্যতা সেই অনুযায়ী পদ দেয়নি। ইচ্ছা করে ট্রেনিং পিরিয়ড বাড়িয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে ছ'-সাত জন ট্রেনি অবস্থায় মারা গেল। কেউ রোগে মরল, কেউ বা অ্যাক্সিডেন্টে। উসকো পরিবারকে লিয়ে আভি কোই সাহারা নেহি বঁচে হ্যায়।

এমন সময় শান্তারাম শেঠিয়া বললেন, দু'হাজার এক সালে জমির দাম একর প্রতি এক লক্ষ টাকা দেবে বলেছিল। তাতেও কেউ জমি দিতে রাজি হয়নি। পুলিশ বেদম মারধর করল। অনেককে জেলে পুরে দিল। আমাকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর অনেক কেস দিল। জোর করে ক্ষতিপূরণের চেক-এ আমাদের আঙুলের ছাপ লাগিয়ে দিল। আমরা একবার থানা ঘেরাও করেছিলাম। পুলিশ গুলি চালাল। আমার ভাতিজার গুলি লেগেছিল। মোট সাত-আট জন গুলিতে আহত হয়েছিল।

মহেন্দ্র বললেন, এসব দু'হাজার এক সালের কথা। চার গাঁও সে জমিন গয়ি। তিন পঞ্চায়েত থি, চার গাঁও। পঞ্চায়েত কা নাম থা নগরনার, কস্তুরী আউর আমাগুড়া। সরকার বলেছিল, যাদের জমি নিচ্ছি, তাদের বিকল্প জমি দেব। সেই জমির পাট্টা দিয়ে দিল। এমনকী জমিতে গাছ পোঁতার জন্য টাকাও দিল। কিন্তু জমি কেউ পায়নি। ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন, জমিতে গাছ বসানোর জন্য টাকা দিয়ে দিল, এদিকে তখনও জমিই দেয়নি।

এবার দু'হাজার দশ সালের কথা শুনুন।

সরকার বলল, আমরা আধুনিক মেশিন বসাব। আরও জমি চাই। তখন সবাই দেখল, এনএমডিসি জমির বদলে চাকরি দিচ্ছে। তব লোগোঁ নে শোচা কি, ইয়ে পাবলিক সেক্টর প্ল্যান্ট হ্যায়। শায়দ হম প্ল্যান্ট কে সাথ দেঁ তব হামকো কুছ ফয়দা হো সকতে হ্যায়। তব লোগোঁ নে আপনা মরজি সে দো হাজার দশ মে জমিনো কো দিয়া।

সেবারও এগারশ একর জমিই নিয়েছিল। তখন বলেছিল, দো সাল কে অন্দর সবকো নোকরি দে দেঙ্গে। লেকিন আজ তক নেহি দিয়া। আটশ আটত্রিশটি পরিবার জমি দিয়েছিল। তারা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন ওদের স্টাইপেন্ড দেয়। যারা আনপড় লোক, তাদের মাসে পাঁচ হাজার, যারা একটু আধটু লেখাপড়া জানে তাদের দশ হাজার ও বেশি লেখাপড়া জানা লোকেদের পনের হাজার টাকা। দ্বিতীয় দফায় যাদের জমি গেল, তারাও চাকরির দাবিতে আন্দোলন করেছিল।

শান্তারাম শেঠিয়া বললেন, আর একটা কথা শুনুন, চাকরি শুধু ছেলেদের দিয়েছে। মেয়েদের দেয়নি।

মহেন্দ্র বললেন, দো হাজার সতেরা মে ফির জমি লেনে কা কোশিস হো রহা হ্যায়। লেকিন অব বিরোধ হো রহা হ্যায়। এখন শোনা যাচ্ছে এই কারখানা বেসরকারি হাতে তুলে দেবে। কিছুদিন আগে চুকাওয়াড়ায় গ্রামসভা ডেকে বলেছিল, ওখানে আইটিআই ভবন আর পলিটেকনিক কলেজের জন্য জমি চাই। কিন্তু গ্রামবাসীরা সরকারি লোকেদের তাড়িয়ে দিল। তাদের ধারণা, সরকারের নাম করে জমি নিয়ে প্রাইভেট হাতে তুলে দেওয়ার মতলব আছে।

উনিশশ বিরানব্বই সালে এখানে মুকুন্দ স্টিল কোম্পানি কারখানা বানাতে এসেছিল। কিন্তু প্রাইভেট সংস্থাকে কেউ জমি দিতে রাজি হয়নি। ওই নিয়ে আন্দোলন হল। মুকুন্দ পালিয়ে গেল। কিন্তু সেই কোম্পানির নকশা দিয়ে গেল এনএমডিসি-র হাতে। তারপর সরকারের নাম করে অধিগ্রহণ শুরু হল। এতদিন বাদে অধিগৃহীত জমি বেসরকারি হাতে তুলে দিতে চাইছে। আমরা চাই, সারা দেশে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ুক।

এরপর মহেন্দ্র আমাদের উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন, আপলোগ যব মানবাধিকার সে আয়ে হুয়ে হ্যায়, ইতনি জনকারি লে রহে হ্যায়, ইসকে বাদ আপ হামারে কিস তরিকে সে মদত করেঙ্গে, কেয়া মদত করেঙ্গে, ইয়ে হম জাননা চাহতে হ্যায়। আপনারা তো আমাদের সম্পর্কে এত খোঁজখবর নিচ্ছেন, এবার বলুন দিকি মশাই, আপনারা কীভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারেন?

গৌতম দু'টো আঙুল দেখিয়ে বললেন, দো তরিকেসে হম মদত করেঙ্গে। আমরা দু'ভাবে সাহায্য করব।

প্রথমত, আমাদের মধ্যে অনেক সাংবাদিক আছেন, তাঁরা আপনাদের লড়াইয়ের কথা সকলকে জানাবেন। পত্রপত্রিকায়, সোশ্যাল মিডিয়ায় এসব নিয়ে লিখবেন।

দ্বিতীয়ত, নানা রাজ্যে আমাদের সংগঠন আছে। আপনারা যদি দিল্লি, হায়দরাবাদ, চেন্নাই, কলকাতা অথবা পাঞ্জাবের কোথাও যান, সেখানকার লোককে নিয়ে সভা করেন, আমাদের লোকজন আপনাদের সাহায্য করবে। আমাদের ঠিকানা তো আপনাদের দেওয়াই রইল।

আমরা উঠে আসছি, এমন সময় শ্রমিকরা স্লোগান দিল, নিজিকরণ ওয়াপস লেনা হোগা লেনা হোগা!

দুপুর তিনটে

এবার গন্তব্য পালমের। বনের মধ্যে দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। ঘণ্টা দু'য়েকের রাস্তা। বিরাট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা স্কুল। তার গায়ে লেখা সর্বশিক্ষা অভিযান। স্কুলের বাইরে আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন সোনি সোরি। তাঁর সঙ্গে সকালে গেস্ট হাউসে কথা হয়েছিল, ফের দেখা হয়ে গেল। তিনি আগে এই অঞ্চলে থাকতেন। খানিক দূরে একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, দু'হাজার এগার সালে আমাকে ওইখান থেকে অ্যারেস্ট করেছিল।

সেবার সোনি সোরি পুলিশ হাজতে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেন। সেকথা সারা দেশ জানে। স্কুলে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংয়ের সময় তিনি সঙ্গে থাকলে আমাদের সুবিধাই হবে।

ছত্তিশগড় রাজ্য সরকার এই স্কুলটি চালায়। রেসিডেন্সিয়াল স্কুল। কিছু দূরে হোস্টেল। মেয়েরা সেখানে থেকে পড়াশোনা করে। বাইরে থেকেও কেউ কেউ আসে। যে সব লোকেরা মাওবাদীদের বিরুদ্ধে পুলিশ আধা সেনাকে সাহায্য করেছিল, তাদের ছেলেমেয়েরা যাতে পড়াশোনা শিখে মানুষ হয়, সেজন্য সরকার স্কুল বানিয়ে দিয়েছে।

স্কুলে ভিজিটিং আওয়ার বিকাল চারটে থেকে ছ'টা। আমরা সাড়ে চারটে নাগাদ স্কুলে পৌঁছেছি। কিন্তু দরোয়ান বলল, কারও সঙ্গে দেখা হবে না, স্কুল বন্ধ। আমরা বললাম, সে কী কথা, আমরা কতদূর থেকে আসছি, দেখা হবে না বললে হয় কখনও? কিন্তু দারোয়ানের এক কথা, স্কুল ছুটি হয়ে গেছে, এখন বাইরের কারও ভিতরে যাওয়া মানা। আমাদের একজন প্রশ্ন করল, তাহলে একত্রিশে জুলাই সন্ধেবেলা সিআরপিকে ভিতরে যেতে দিয়েছিলে কেন হে?

দারোয়ানজি ওই প্রশ্নের জবাব দেওয়ারই প্রয়োজন বোধ করল না।

তারপর সোনি সোরি আমাদের বিস্তারিত বললেন, ওখানে কী হয়েছিল আর কেমন করে সব জানাজানি হয়ে গেল।

রাখির দিন স্থানীয় এক টিভি চ্যানেল গার্লস হোস্টেলের ভিতরে উৎসবের আয়োজন করে। হোস্টেল চত্বরে ম্যারাপ বেঁধে মঞ্চ বানিয়েছিল। মাইকে খুব জোরে চটুল গান বাজছিল। মঞ্চের ওপরে সিআরপি জওয়ানরা নাচানাচি করছিল। তার একটা ভিডিও ক্লিপও দেখলাম।

কথা ছিল সেই মঞ্চে উঠে মেয়েরা জওয়ানদের হাতে রাখি পরিয়ে দেবে, টিভি চ্যানেল ছবি তুলবে এবং চারদিকে দেখিয়ে বলবে, সিআরপি কত ভালো, আদিবাসী মেয়েদের সঙ্গে ভাই-বোনের সম্পর্ক পাতিয়েছে।

কিন্তু জওয়ানরা তো সেই আদ্যিকালের রাজা দণ্ডের উত্তরসুরী, তারা চোদ্দ-পনের বছর বয়সী কিশোরীদের দেখে ভাবছিল, এদের গুটিকতককে শিকার করা যাক। মঞ্চের ওপরে হইহুল্লোড়, নাচাগানা চলছে কিন্তু তারা সর্বক্ষণ তক্কে তক্কে আছে, কখন ছাত্রীদের দু'-একজনকে একলা পাওয়া যায়।

এমন সময় জনাকয়েক ছাত্রী শৌচাগারে গেল। অমনি কয়েকজন জওয়ান ফলো করল তাদের।

শৌচাগার ছিল মঞ্চ থেকে একটু দূরে। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি।

জওয়ানদের একজন মেয়েগুলিকে হাঁক দিয়ে বলল, এই তোরা কী করছিস এখানে?

আর একজন জওয়ান বলল, নিশ্চয় কিছু বদমতলব আছে তোদের। আমাদের মারার জন্য মাওবাদীরা কি তোদের বন্দুক দিয়েছে? বোমা দিয়েছে? শিগগির সব কথা খুলে বল। নইলে খুন করে ফেলব।

ভীতসন্ত্রস্ত মেয়েগুলি প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু তাদের কথা আর কে শুনছে।

জওয়ানরা হুকুম দিল, তোরা দেওয়ালের দিকে মুখ করে দুই হাত ওপরে তুলে দাঁড়া। তোদের সার্চ করব। দেখি তোরা পোশাকের মধ্যে কোনও আর্মস লুকিয়ে রেখেছিস কিনা!

মেয়েরা সেদিনই হস্টেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে সব কথা খুলে বলেছিল। আধিকারিক তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালেন। জেলা প্রশাসনের উচ্চস্তরেও ব্যাপারটা জানাজানি হল।

ঘটনার পরদিন, পয়লা আগস্ট স্কুলে এলেন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকেও ডেকে পাঠানো হল। বাচ্চারা তাঁদের খুলে বলল, কী হয়েছিল। জেলাশাসক বলে গেলেন, আমরা ব্যবস্থা নেব।

সোনি সোরির কথায়, আমি যখন শুনলাম এসপি আর জেলাশাসক স্কুলে গেছেন, তখন ভাবলাম, নিশ্চয় একটা বিহিত হবে। ফির ম্যয় দো তারিখ আখবর দেখা, ভাবছিলাম, প্রশাসন যদি ব্যবস্থা নেয় নিশ্চয় খবরের কাগজে ছাপবে। কিন্তু দু'তারিখের কাগজে কিছু ছাপেনি।

আমি নিজে তিন তারিখে গেলাম হস্টেলে। ওয়ার্ডেনের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে বললাম, যে ছাত্রীরা অভিযোগ করেছে তাদের সঙ্গে কথা বলব। তিনি বললেন, কেয়া বাত করনা হ্যায়। যো বাত করনা হ্যায় এহিঁ করো। আমি বললাম, শোনা যাচ্ছে একত্রিশ তারিখে সন্ধেবেলায় হস্টেলে কয়েকজন ছাত্রীর সঙ্গে সিআরপি অসভ্যতা করেছে। এই খবর কি সত্যি?

তব ওয়ার্ডেন নে বোলি, ঝুট বলতি হো আপ। হম পে আরোপ লাগাতি হো। অ্যায়সা কুছ নেহি হুয়া। আপকো কৌন বাতায়া? কাঁহাসে সুন্না অ্যায়সা কুছ হুয়া হি নেহি।

আমি বললাম, এক তারিখ মে কালেক্টর ভি আয়ে থে। কিছু যদি না-ই হয়ে থাকে, তিনি এলেন কেন্না ওয়ার্ডেন বললেন, আরে উনি তো স্কুলের কাজকর্ম কেমন চলছে দেখতে এসেছিলেন। ক্লাসরুমে আলো জ্বলছে কিনা, কলঘরে জল আছে কিনা, এইসব ঘুরে ঘুরে দেখলেন।

আমি বললাম, কী আশ্চর্য, কালেক্টরের হাতে এত সময় আছে যে তিনি স্কুলে আলো জ্বলছে কিনা নিজে দেখতে এসেছেন? অব ঝুট কিঁউ বোল রহে হো? তব উনহে বতায়া, ঝুট নেহি, ম্যঁয় সচ বাতাতা হুঁ। আপনি যে অভিযোগ করছেন, আপনার কাছে কোনও প্রুফ আছে কি?

আমি বললাম, জরুর প্রুফ আছে। আমার কাছে একটা ভিডিও রেকর্ডিং আছে। একথা শুনে ওয়ার্ডেন ঘাবড়ে গেলেন। আমাকে বললেন, কোথায় সেই ভিডিও? আমাকে দেখান। আমি বললাম, আপনাকে কেন দেখাব? আপনি তো মিথ্যা কথা বলছেন। আমি চলে যাচ্ছি। লেকিন যাতে যাতে অব ম্যঁয় বোলকে যা রহা হুঁ, তিন-চারদিনের মধ্যেই আমি সত্য ঘটনা প্রকাশ করে দেব। ইসমে কেয়া হুয়া আউর নেহি হুয়া

অটোমেটিক আপ কো পতা চল যায়েগা।

ওয়ার্ডেনকে ওইসব বলে এলাম বটে কিন্তু কীভাবে সত্য ঘটনা বাইরে প্রকাশ করা যাবে, তা তখনও জানতাম না।

কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেই তো হল না, যথাযথ তথ্যপ্রমাণ চাই। সাক্ষী চাই। সেসব কোথা থেকে পাব?

স্কুল থেকে বেরিয়ে আমি তো হতাশ হয়ে পড়লাম। খানিক দূরে রাস্তার ধারে বসে ভাবছি কী করা যায়। এমন সময় দেখি তিনটে বাচ্চা আসছে। এখানে অনেকে যেমন হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে, অনেকে আবার আশপাশের গ্রাম থেকেও আসে। ওই তিনটে বাচ্চা বাইরে থেকে স্কুলে আসছিল।

আমি ভাবলাম, ওদের একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি। ওরা সহজে কিছু বলতে চাইছিল না। তখন ওদের জিজ্ঞাসা করলাম, কিতনে দূর সে আতে হ্যায় তুমলোগ? ওরা বলল, চার কিলোমিটার কে আসপাস। আমি বললাম, তোমরা এত দূর থেকে যাতায়াত কর, এখানে আশপাশে কত পুলিশ আছে, তোমাদেরও কোনও দিন তুলে নিয়ে যেতে পারে। বাচ্চারা বুঝল, কথাটা তো ঠিকই, কিসি দিন হামারা সাথ ভি সিআরপিএফ অ্যায়সা না করে!

তব বচ্চেঁ নে বাতায়া, হ্যাঁ ম্যাডাম, অ্যায়সা হুয়া থা। আমাদের ক্লাসের তের জন মেয়ে আর উঁচু ক্লাসের তিন দিদির সঙ্গে এমন হয়েছে।

চার, পাঁচ, ছয় আগস্ট, তিনদিন ধরে আরও কয়েকজন বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করলাম। গ্রামে গ্রামে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছে জানতে চাইলাম, কী হয়েছিল? ছ'তারিখে শুনলাম, ওই রাখিবন্ধন উৎসবের ছবি টিভিতে দেখাবে, গ্রামে কত কী উন্নয়ন হয়েছে, তাও দেখাবে। সারা দেশের সামনে বার্তা দেবে, বনবাসীদের জন্য অনেক ভালো ভালো কাজ হচ্ছে।

সাত তারিখে টিভিতে ওই প্রোগ্রাম হওয়ার কথা।

আমরা আগাগোড়া হিমাংশু স্যারকে ব্যাপারটা জানাচ্ছিলাম। ছয় তারিখে তিনি বললেন, তোমরা কী কী প্রমাণ পেয়েছ আমাকে জানাও, তার ভিত্তিতে আমি লিখব। সাবধান! আমাদের হাতে যেন যথেষ্ট প্রমাণ থাকে। না হলে ইস স্থিতি হামারে লিয়ে ভারী পড়েগা, আপ কো লিয়ে ভি ভারী পড়েগা।

হিমাংশু কুমারও যে সোনি সোরিকে সাহায্য করেছিলেন আগে জানতাম না। এই প্রথম শুনলাম।

সোনিজি বলে চলেছেন, ছ'তারিখ সন্ধে বেলায় তো হিমাংশু কুমার পুরো ঘটনার বিবরণ দিয়ে একটা লেখা হোয়াটসঅ্যাপে পোস্ট করে দিলেন। অনেকে সেদিন রাতের মধ্যেই পড়ে ফেলল। আরও অনেকে পরদিন সকালে পড়ল। তারপর সাত তারিখ সন্ধেয় টিভিতে দেখাল, সিআরপি জওয়ানরা স্কুলে ভিতরে নাচছে। সবাই বলাবলি করতে লাগল, ওই দেখ দেখ, স্কুলের ওই ফাংশানেই জওয়ানরা মেয়েদের সঙ্গে অসভ্যতা করেছিল। ...তো শোর মচ গয়া।

অব উসকে বাদ সারি মিডিয়া নে কালেক্টর কো পুছনে লাগা, ওই যে টিভিতে জওয়ানদের নাচতে দেখা যাচ্ছে, ওরা নাকি স্কুলের মধ্যে অসভ্যতা করেছে? একথা কি সত্যি?

তব ওহ লোক শোচা, অব তো বচ নেহি সকতে। টিভিতে দেখিয়ে দিয়েছে। তখন এসপি আর কালেক্টর, দু'জনেই স্বীকার করলেন, হ্যাঁ একটা এফআইআর হয়েছে।

এর মধ্যে ন'তারিখে ছিল বিশ্ব আদিবাসী দিবস। বয়লাডিলা ও আরও নানা জায়গায় আদিবাসীরা অবরোধ করল। প্রশাসন দেখল, বিপদ। দুই জওয়ানকে সাসপেন্ড করে দিল। তারপর বলতে লাগল, এই দ্যাখো, আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি।

মোট ষোল জন ছাত্রীর শ্লীলতাহানি হয়েছিল। মাত্র দু'জন জওয়ান মিলে ওই কাজ করেছে? তা কখনও হয়? আরও অনেকে ছিল। দু'জনকে বলির পাঁঠা বানিয়ে বাকিদের বাঁচাচ্ছে। আমি শুনেছি, যে দুই জওয়ান শাস্তি পেয়েছে তাদের সঙ্গে আগে থেকেই অফিসারদের মন কষাকষি চলছিল। এই সুযোগে ফাঁসিয়ে দিল আর কি!

সে যাই হোক, পুলিশ বাচ্চাদের থেকেও বয়ান নিয়েছিল। রোজ তাদের বন্ধ ভ্যানে করে কোর্টে নিয়ে যেত। চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে বয়ান নিত। আমাদের সঙ্গে দেখা করতে দিত না। মনে হত যেন বাচ্চাগুলোই অপরাধী।

সোনিজির কথা শুনতে শুনতে আমি ভাবছিলাম, এই সব বাচ্চার বাবা-কাকারাই এতদিন পুলিশ-সিআরপিকে গোপনে মাওবাদীদের গতিবিধি জানিয়ে দিয়েছে। কেউ আবার প্রাইভেট আর্মিতে যোগ দিয়ে সরাসরি মাওবাদী নিধনে নেমেছে। কিন্তু সিআরপি তাদের মেয়েদেরও ছাড়েনি।

মনে হয়, এই স্কুলের ছেলেমেয়েরা কখনও বাবা-কাকাদের মতো পুলিশ-সিআরপিকে সাহায্য করবে না। তাদের বাড়ির বড়রা, যারা সালওয়া জুডুমে যোগ দিয়েছিল, তারাও বিবেক দংশনে ভুগবে। মনে ভাববে, পাড়াপ্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পুলিশ-সিআরপিকে লেলিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। এর ফলে আগামী দিনে আদিবাসীদের কাউকে জঙ্গলে স্পাই বানানো অথবা প্রাইভেট আর্মিতে ভিড়িয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

আরও একটা কথা, আমরা জানতে পারলাম, টিভিতে দেখানোর আগেই স্কুলে জওয়ানদের নাচানাচির ভিডিও চিত্র সোনি সোরির হাতে চলে এসেছিল।

কে দিল?

এই প্রশ্নটা সোনি সোরিকে করা হয়নি। করা সঙ্গতও নয়। কিন্তু আন্দাজ করা যায়, স্কুলের স্টাফেরা কেউ কৌশলে মোবাইলে জওয়ানদের ছবি তুলে রেখেছিল। সুবিধামতো সোনিজির হাতে তুলে দিয়েছে। অর্থাৎ তারাও গোপনে গোপনে সিআরপি-র বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে।

সিআরপি-র চারপাশে এমন কত গোপন শত্রু ছড়িয়ে আছে কে জানে।

তেরই আগস্ট

আমাদের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম যে সহজে বনে ঢুকতে পারবে না, সেকথা একরকম জানাই ছিল। আমরা মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম, যে করে হোক অকুস্থলে যাবই। কিন্তু ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত এত গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে কেউ ভাবেনি।

পুরো ঘটনা শুরু থেকে বলছি।

বারই আগস্ট বিকালে তো আমাদের স্কুলে ঢুকতে দিল না। ভিকটিম অথবা তাদের বন্ধুদের সঙ্গে কথাও বলা হল না। তবে সোনিজির কাছে জানতে পারলাম অনেক কিছু।

ওখান থেকে ঘণ্টা তিনেকের পথ পেরিয়ে সন্ধে নাগাদ কৈলাসনগর নামে একটা জায়গায় এসে পড়া গেল। এখানকার এক হোটেলে রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত। হোটেলের নাম মধুবন। কৈলাসনগর জায়গাটা নামেই শহর। আসলে মফঃস্বল। চারপাশে অনেক গাছপালা। মনে হয়, এখান থেকে জঙ্গল বেশি দূরে নয়।

ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে এক গাইড এসে জুটেছে। সে আদিবাসী মেয়ে। বয়স কুড়ির কোঠায়। তাকে মাওবাদী বলে পুলিশে ধরেছিল। বেচারা পাঁচ-ছ'বছর জেলে কাটিয়েছে। এখন জামিন পেয়ে বাইরে। তার আসল নাম লেখা বারণ। আমি তার নাম দিয়েছি বনজা।

ওই মেয়ে জঙ্গলের মধ্যে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। যাদের বিরুদ্ধে এত বন্দুক, রাইফেল আর উর্দিধারী আধা সেনার প্রয়োজন, সেই মাওবাদীদের সঙ্গেও হয়তো কথা বলিয়ে দেবে।

ভোর সাড়ে ছ'টা

আমরা মধুবন হোটেল থেকে রওনা হয়েছি। জঙ্গলের দিকে যাচ্ছি। গন্তব্য বরকাপাল।

খানিক দূর অবধি বেশ গেলাম। গাছপালা, ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে দিব্যি পাকা সড়ক। এক জায়গায় দেখি রাস্তার ধারে বড় হোর্ডিং লাগানো, তাতে দেবনাগরী হরফে লেখা, ইকো পর্যটন কেন্দ্র। তুঙ্গল জলাশয়। প্যাডেল বোটিংয়ের সুবিধা। সুকমা জেলা প্রশাসন হোর্ডিং লাগিয়েছে। তার মানে কাছেই ট্যুরিস্ট স্পট। এই যে শুনি সুকমায় মাওবাদীরা খুব দৌরাত্ম্য করে, তাদের দাপটে লোকে তিষ্ঠোতে পারে না, তা হলে পর্যটনের ব্যবসা চলে কীভাবে?

ওখান থেকে খানিক দূরে দেখি, অনেকখানি এলাকা ঘিরে উঁচু পাঁচিল, তার ওপরে কাঁটাতারের বেড়া। পাঁচিল ঘেরা চত্বরের মধ্যে দোতলা বাড়ি। দেওয়ালের রং সাদা, তার আলসেয় কালচে লাল রংয়ের বর্ডার। অনেকটা শুকিয়ে যাওয়া রক্তের মতো রং।

বাড়ির গায়ে দেবনাগরী হরফে বড় বড় করে লেখা, উপ জেল, সুকমা। আমরা এখন জেলের কাছাকাছি।

জেলের সামনে একদল সিআরপি দাঁড়িয়ে। পুলিশও আছে। রাস্তা দিয়ে যত গাড়ি, অটো ইত্যাদি যাচ্ছে, সবাইকে থামাচ্ছে। আরোহীদের সঙ্গে আধার কার্ড আছে কিনা চেক করছে।

এইবার মনে হচ্ছে আমরা শক্ত বাধার মুখে পড়তে চলেছি।

জংলা আর খাঁকি পোশাক পরা বীরপুঙ্গবরা আমাদেরও হাত দেখিয়ে থামাল। আধার কার্ড দিখাইয়ে। তারপর সকলের নাম, বাড়ির ঠিকানা, বাবার নাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করতে লাগল। একটা খাতায় লিখে নিচ্ছে।

রাস্তায় অন্যান্য পথচারী বা গাড়ির আরোহীদের আধার কার্ড দেখে ছেড়ে দিচ্ছিল। কিন্তু আমাদের বেলায় নামধাম জিজ্ঞাসা করছে কেন?

আমাদের একজন বলল, ব্যাটারা বদমায়েশের ধাড়ি। এসব আমাদের দেরি করিয়ে দেওয়ার ফিকির।

কথাটা সম্ভবত সত্যি। কারণ আমি দেখলাম, প্রত্যেকের নাম, বাবার নাম ইত্যাদি খুব আস্তে আস্তে একটা খাতায় টুকে নিচ্ছে। সময় নষ্ট করার ফন্দি।

তার মানে ওরা আগে থেকে জানে আমরা কারা, কোথায় যাচ্ছি। কিন্তু কিছু না জানার ভান করে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কদ্দুর যাবেন?

জঙ্গলে যেতে চাই শুনে ঘাড় নেড়ে বলছে, উঁহু, যাওয়া বারণ।

-কেন জঙ্গলে যাওয়া যাবে না?

-ওপরতলার হুকুম।

-কোথায় তোমাদের ওপরতলা? আমরা তার সঙ্গে কথা বলব।

ওইখানে আর এক দফা দেরি করল। নানারকম গাঁইগুই করছে, আমরা তো বলছি জঙ্গলে যাওয়া মানা, আবার অফিসারদের সঙ্গে দেখা করে কী করবেন? আমরাও নাছোড়বান্দা, কোথায় তোমাদের বড় কর্তা, নিয়ে চল তার কাছে। অনেকক্ষণ বাদে তারা বলল, বেশ তো চলুন।

এই বলে খানিক দূরে এক স্কুল কম্পাউন্ডের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ওইখানে বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে।

জংলা ছাপ পোশাকের সেপাইদের বললাম, আমাদের এখন ব্রেকফাস্ট করা হয়নি। তারা বলল, ওই তো রাস্তার ওপারে দোকান। যান না, নাস্তা করে আসুন।

সামনেই সুকমা বাস স্ট্যান্ড। জায়গাটা বেশ জমজমাট। অনেকগুলো দোকানপাট আছে। শান্তি কামতা স্টোর্স নামে এক রেস্তোরাঁয় ঢুকলাম। রীতিমতো আধুনিক রেস্তোরাঁ। শহুরে বাবুদের যা যা লাগে, চা, পেপসি, চিপস, সিঙাড়া, পুরী, তরকারি সব মজুত। রাস্তার ওপার থেকে খাঁকি আর জংলা ছাপ উর্দিধারীরা আগাগোড়া আমাদের ওপরে লক্ষ রাখছে, একটু এদিক ওদিক করলেই ধরবে। আমরা ওদের নজরবন্দি।

আমরা অনেকে ধোসা খেলাম। ধোসাগুলো বেশ হৃষ্টপুষ্ট। একবেলার আহারের জন্য একখানি যথেষ্ট। আবার কখন খাবার জুটবে কে জানে! বেশি করে খেয়ে নেওয়াই ভালো। আমি অবশ্য ভয়ে ভয়ে ছিলাম। বেশি খেলে পেটের রোগ পেয়ে বসে যদি।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ফের খাঁকি আর জংলা পোশাকের খপ্পরে। ওরা আমাদের স্কুল কম্পাউন্ডে নিয়ে গেল। বনজা তখনও দোকানেই

বসে আছে। তাকে যদি পুলিশ চিনে ফেলে তো অনর্থ হবে। তাকে বলে এলাম, যদি শুনতে পাও আমাদের অ্যারেস্ট করেছে, তুমি এখান থেকে চলে যেও। সে বলল, আচ্ছা।

স্কুলের মধ্যে একটা বড়সড় ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। মনে হয় কনফারেন্স রুম। অনেকগুলো চেয়ার ছিল, পুলিশের লোকেরা আরও কতগুলো চেয়ার এনে দিল। সবাই মিলে বসলাম। মাথার ওপরে পাখা চলছে। খানিক বাদে দু'-তিনজন অফিসার এসে ঢুকলেন। জংলা ছাপ আর খাঁকি, দু'রকমের পোশাকের অফিসারই ছিলেন। তাঁরাও বলতে লাগলেন, আরে বাপরে! এখন আপনাদের কী করে বনে যেতে দেব? সামনে পনেরই আগস্ট। মাওবাদীরা আবার পনেরই আগস্ট, স্বাধীনতা দিবস, এসব মানে না। দেশদ্রোহী তো, তাই অমন। পনেরই আগস্টে ওরা ভারী গন্ডগোল পাকায়, মারপিট করে, দুমদাম মাইন ফাটায়। আপনারা জ্ঞানী-গুণী লোক, ওই অশান্তির মধ্যে মধ্যে গিয়ে যদি আপনাদের ভালোমন্দ কিছু হয়ে যায়, তা হলে কী হবে? আমাদের চাকরি বাঁচানো মুশকিল হবে! না, না এখন আপনাদের বনে যেতে দিতে পারব না।

অফিসাররা অনেকক্ষণ ধরে এমনতর ধানাই পানাই করে চললেন। অনেক সময় নষ্ট হল।

তাঁরা শেষকালে বললেন, আপনারা যদি নিতান্তই বনে ঢুকতে চান, তা হলে যান, ওপরতলা থেকে পারমিশন নিয়ে আসুন।

সেই শুনে গৌতম নাভালকা ক্ষেপে আগুন, আর কত ওপরতলায় যেতে হবে? শেষকালে তো বলবেন, দিল্লি থেকে পারমিশন নিয়ে এস!

পুলিশ এবং সিআরপি-র অফিসারদের দেখলাম, সময়মতো মাথা ঠান্ডা রাখতে জানেন। গৌতম যতই উত্তেজিত হোন না কেন, তাঁরা খুব মোলায়েম সুরে জানিয়ে দিলেন, দিল্লি অবধি যেতে হবে না। এখানকার এএসপি সাহাব অথবা ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরের অনুমতি নিয়ে এলেই চলবে।

আমরা অগত্যা বললাম, চলুন তাঁদের অফিসে।

ওখান থেকে ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরের অফিস নেহাৎ কাছে নয়, গাড়িতে চড়ে যেতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগে। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিরাট কম্পাউন্ড, তার মধ্যে সুন্দর করে সাজানো বাগান, সুইমিং পুল, দেখলেই মনে হয়, এখানে রইস আদমিদের বাসা।

আমাদের যে ঘরে বসাল, সেখানটাও ফাইভ স্টার হোটেলের মতো ঝকঝকে তকতকে, মেঝে কালো গ্রানাইট পাথরে মোড়া। আমাদের খানিক অপেক্ষা করিয়ে এসএসপি সাহেব ঢুকলেন। সঙ্গে আরও কয়েকজন হোমরা চোমরা।

এখানেও সেই এক কথা, আপনারা কত নামি দামি লোক, দেশের নানা প্রান্ত থেকে এসেছেন, এই বিপদের সময় কী করে আপনাদের জঙ্গলে ঢুকতে দিই! কিছু একটা হয়ে গেলে ওপরওলাদের কাছে কী কৈফিয়ৎ দেব?

আমরা ছাড়ব না, ওঁরাও যেতে দেবেন না।

ঘণ্টাখানেক ধরে এইরকম তর্কাতর্কি চলতে লাগল। মাঝে একবার এসএসপি সাহেব বলে বসলেন, আপনারা তো আগে এখানে এসেছিলেন বলছেন, এবার এসে কোনও উন্নয়ন চোখে পড়ছে না?

গৌতম অমনি লুফে নিলেন প্রশ্নটা, নিশ্চয় চোখে পড়ছে। এই তো দেখছি, কত নতুন নতুন থানা হয়েছে, পাঁচ-ছ'কিলোমিটার অন্তর সিআরপি ক্যাম্প হয়েছে, রাস্তা দিয়ে যে যাচ্ছে তার পরিচয়পত্র চেক করছে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাকা রাস্তা হয়েছে, আপনাদের মতো বড় বড় অফিসারের জন্য সুইমিং পুল হয়েছে, বাগান হয়েছে, সব তো দেখছি। একেই আপনারা উন্নতি বলছেন তো?

তা বেশ। তা বেশ।

কিন্তু আমরা যাচ্ছি গাঁয়ের খবর নিতে। আপনাদের অনেক উন্নতি হয়েছে বুঝতে পারছি, কিন্তু সে তো রুটির একটা পিঠ। অপর পিঠটায় কী আছে, আদিবাসীরা কেমন করে বেঁচে আছে, সেকথা জানতেই তো আমাদের এতদূর আসা।

গৌতমের কথায় যথেষ্ট শ্লেষ ছিল, এএসপি সাহেব নিশ্চয় বুঝেছেন। তিনি বুদ্ধিমান লোক, বুঝবেন না তা কি হয়? কিন্তু ভাব দেখাচ্ছেন যেন কিছু বোঝেননি। খুব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, নিশ্চয় যাবেন, জঙ্গলে গিয়ে যার সঙ্গে খুশি কথা বলবেন, কিন্তু এখন নয়। সামনে পনেরই আগস্ট, কখন কি ঘটে যায় কিচ্ছু বলা যায় না। আপনাদের ভালোমন্দ কিছু হয়ে গেলে আমাদের বড় লজ্জায় পড়তে হবে। আপনারা পনেরই আগস্টের পরে আসুন, আমি কথা দিচ্ছি, কেউ আপনাদের বাধা দেবে না।

তিনি এই শেষের কথাটা বার বার বলতে লাগলেন, তখন কেউ আপনাদের বাধা দেবে না, তখন কেউ আপনাদের বাধা দেবে না...।

আমরা সকলেই মনে মনে বুঝতে পারছি, এই রে, আমাদের দণ্ডকারণ্য সফর ভণ্ডুল হয়ে গেল। এখান থেকেই ফিরে যেতে হবে।

তাও গৌতম শেষবারের মতো গায়ের ঝাল মিটিয়ে দু'কথা শুনিয়ে দিলেন, নিজেদের গাঁটের পয়সা খরচ করে এতদূর এসেছি মশায়, শুধু আপনাদের গালগপ্পোগুলো শুনে চলে যাব, তা কি হয়? আমরা গ্রামের গরিব লোকজনের সঙ্গে কথা বলব। তবে তো বুঝব, কেমন উন্নয়ন হচ্ছে এখানে।

-আহা, আমি তো বলছি, পনেরই আগস্টের পরে আসুন, কেউ বাধা দেবে না।

এমন তর্কবিতর্কের মাঝে আমরা লক্ষ করেছি, এএসপি-র অফিসের চারপাশে ঘুরঘুর করছে জংলা পোশাক পরা যণ্ডামার্কা জওয়ানের দল, ওরা রেগুলার সকালে উঠে মুগুর ভাঁজে, ইয়া হাতের গুলি, সাহেবরা ইশারা করলেই আমাদের এক এক করে ধরে জেলে ঢুকিয়ে দেবে।

আমরা ছোটখাটো টিম নিয়ে এলে নিশ্চয় এতক্ষণে ঢুকিয়ে দিত। কিন্তু টিমে আঠার জন আছি, অতজনকে একসঙ্গে জেলে ঢোকানো মুশকিল। তাতে ঝঞ্ঝাট অনেক। নানা মহল থেকে প্রতিবাদ হবে, তখন সরকারের মুখ পোড়ার সম্ভাবনা।

এএসপি যখন কিছুতেই রাজি হলেন না, তখন আমরা তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একটা গাছের তলায় বসলাম। ওইখানেই চটজলদি মিটিং। অতঃপর আমরা কী করব, তাই আলোচ্য বিষয়। খুব বেশি কিছু যে করার নেই, তা তো জানি। আমরা এখন পুলিশ আর সিআরপি-র খপ্পরে। বেরনো অসম্ভব।

অতএব পাততাড়ি গোটাও।

বেলা আড়াইটে

আমরা ফিরতি পথে। পথে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে হোটেলে খেয়ে নিয়েছি ভাত, ডাল, সবজি, সঙ্গে ছোট্ট এক টুকরো মাছ।
গাড়িতে যেতে যেতে ভাবছি, আর কি কখনও আসা হবে এখানে? পনেরই আগস্টের পরে এলে ঢুকতে দেবে বলেছে, কিন্তু ফের নানা প্রদেশ থেকে এতজনকে জুটিয়ে নিয়ে আসা কি সোজা কথা! তার ওপরে খরচও তো আছে। সকলেই যে যার নিজের পয়সায় এসেছি। বার বার কি অত খরচ করা যায়!
সবচেয়ে বড় কথা, সত্যিই যদি আবার এসে পড়ি, নতুন করে যে কোনও ওজর-আপত্তি তুলবে না তার গ্যারান্টি কি
বনজার কথাও মনে পড়ছিল। তাকে আর দেখতে পাইনি। মেয়েটা এখন কোথায়? সে কি নিরাপদে হোটেল থেকে চলে যেতে পেরেছে?
৮

সন্ধে ছ'টা

গাড়িতে ঘণ্টা তিনেকের পথ পেরিয়ে সন্ধের মুখে সোনি সোরির বাড়িতে পৌঁছানো গেল। পথের ধারে ইটের একতলা বাড়ি, মাথায় অ্যাসবেস্টসের চাল। বাড়িতে ঢুকেই একটা বড়সড় ঘর, সেখানে তক্তপোষের ওপরে পাঁচ-ছ'জন পুলিশ বসে আছে। তার মধ্যে দু'জনের পরনে ইউনিফর্ম। বাকিরা সিভিল ড্রেসে। তাদের মুখ ভাবলেশহীন।

এর আগে সোনিজির ওপরে গুন্ডারা কয়েকবার হামলা করেছিল, তাই সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে হুকুম দিয়েছে, ওনার জন্য পুলিশি প্রহরার ব্যবস্থা করতে হবে।

পুলিশগুলো আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল, কিছু বলল না। আমরা বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। সোনিজি হাসি মুখে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। বাড়ির একটি কিশোরী মেয়ে আমাদের জন্য দুধমেশানো চা এনে দিল।

আমরা যখন চা খাচ্ছি, সোনিজি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করলেন।

এই অরণ্যে গরিব আদিবাসীদের মেয়েরা প্রায়ই জওয়ানদের শিকার হয়। চিন্তলনাড় গাঁও কে নাম আপ নে শুনা হোগা। সেই গ্রামে একদিন তল্লাশির নামে ঢুকল সিআরপি। তখন আনুমানিক বেলা চারটে। গ্রামে নিজেদের কুঁড়েঘরের ভিতরে শুয়েছিল এক কিশোরী। সিআরপি সেই কুঁড়েঘর ঘিরে ফেলল। মেয়েটির বাবা ও ভাই ছিল বাইরে, তাদের বন্দুক দেখিয়ে বলল, খবরদার! এক পা এগিয়েছিস কি গুলি করব।

গ্রামের লোকজন সব জানতে পেরে ভীষণ ক্ষেপে গেল। পুলিশের কাছে অভিযোগও জানাল। পুলিশ বলল, মেয়েটিকে আমাদের হাতে দাও। আমরা ওর বয়ান রেকর্ড করব।

ওহ লেড়কি কো তিন দিন পুলিশ আপনা কাস্টডি মে রাখা, ইতনা মারে উস লেড়কি কো, ইতনা মারে কি ওহ লেড়কি বয়ান বদল দিয়া, মেরে সাথ কুছ নেহি হুয়া।

পুলিশ বয়ান নেওয়ার নাম করে মেয়েটাকে পুরে দিল লক আপে। তারপর বেধড়ক মার। মারের চোটে সে বলল, কেউ আমার সম্মানহানি করেনি।

সবাই বলতে লাগল, ওহ লেড়কি বয়ান কিঁউ বদলি? কিন্তু সে আমাকে তার পিঠটা দেখিয়েছিল। পুরো লাল হয়ে আছে। তিন দিন ধরে মেরেছে তাকে।

ইস স্থিতি মে ওহ লেড়কি কেয়া করতি থি? উস কো তো জাস্টিস কে লিয়ে কোই ভি যানা থা। ফির উস নে মাওবাদী কে পাস চলা গয়ে।

সোনিজির কথায় মনে পড়ল, দু'হাজার দশ সালে ওই চিন্তলনাড় গ্রামেই মাওবাদী গেরিলাদের আক্রমণ ছিয়াত্তর জন সিআরপি নিহত হয়। তার কিছুদিন আগে গ্রামের নির্যাতিতা মেয়েটি জাস্টিসের জন্য মাওবাদীদের কাছে গিয়েছিল। গ্রামেরও অনেক বাসিন্দা নিশ্চয় চেয়েছিল একটা বিহিত হোক। তারপরেই ওই আক্রমণ। পুলিশ এবং সিআরপি যে মেয়েদের নির্যাতন করেছে, তারাও অনেকে নিশ্চয় গেরিলাদের দলে ছিল।

আমার আবার সেই রামায়ণের কুমারী অবজার কথা মনে পড়ল। এই কলিযুগে দণ্ডকারণ্যে যখন কুমারী মেয়েদের সম্মানহানি হয়, তখন তাদের বাবারাও নিশ্চয় শুক্রাচার্যের মতো অভিশাপ দেয়, সব জ্বলেপুড়ে যাক। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয় না। তারা নিতান্ত গরিব মানুষ, অমন অনেক অভিশাপ, ক্রোধ, দুঃখ বুকের মধ্যে নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেয়। তাতে কারও ক্ষতি হয় না। বরং শোকে তাপে মানুষটাই ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে যায়।

এমনি করে কত লোক যুগ যুগ ধরে ক্ষয়ে গেছে।

কিন্তু তরুণ-তরুণীরা তো এই ভবিতব্যকে মেনে নিতে পারে না। তাই দণ্ডকারণ্যের কোনও নির্যাতিতা কন্যা যখন দেখে রাষ্ট্র অথবা সমাজের কাছে জাস্টিস পাওয়ার আশা নেই, তখন মাওবাদীদের দলে যোগ দেয়।

সোনিজি এরপর বরকাপালের প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন।

ওখানে মাওবাদীরা সিআরপি-কে আক্রমণ করেছিল চব্বিশে এপ্রিল। পরদিন সকালে ওই গ্রামে সিআরপি এক আদমি কো এনকাউন্টার কর দিয়া। ওহ ঘরমে শো রহে থে। ফোর্স আসছে দেখে গ্রামে যত পুরুষ ছিল, সবাই এদিক ওদিক পালিয়ে গেল। কেবল একজন পালাতে পারেনি, ঘরে শুয়ে ছিল। সে আগের রাতে নেশা করেছিল। উঠে পালানোর শক্তি ছিল না। জলদি উসকো ঘর সে উঠাকে লে গয়ে আউর হত্যা কর দি। নিহত ছেলেটি ব্রাহ্মণ ছিল। সে মাওবাদী হতেই পারে না। শুধু শুধু তাকে মারল।

সোনিজির কথায় মনে হয়, এখানকার ব্রাহ্মণরা মনুকে মেনে চলে। তারা সচরাচর মাও সে তুংয়ের অনুগামী হয় না।

পুলিশ-সিআরপি কীভাবে কৌশলে বরকাপালের গ্রামবাসীদের ফাঁদে ফেলেছিল, সোনিজি তারও বিবরণ দিলেন।

সিআরপি-র ওপরে গেরিলা হানার পরে গ্রামবাসীরা বুঝেছিল, বড় ধরনের ধরপাকড় আসন্ন। ওদের এসব অভিজ্ঞতা আছে। তারপর তো সিআরপি গ্রামে ঢুকে একজনকে এনকাউন্টারের নামে মারল। বিপদ বুঝে গ্রামের বাকি পুরুষরা পালিয়ে গেল অন্ধ্রপ্রদেশে।

পুলিশ তখন গ্রামে রেড করে কারও নাগাল পাচ্ছিল না। শেষকালে একদিন খুব ভালোমানুষের মতো গ্রামে ঢুকে মেয়েদের বলল, হ্যাঁরে, তোদের ঘরের ছেলেরা সব বাইরে গেছে কেন? এখন তো চাষের মরসুম। বাইরে গিয়ে বসে থাকলে চলবে? ওদের ফিরে আসতে বল। ভয় নেই। কেউ কিচ্ছু বলবে না।

মেয়েরা দেখল, সত্যিই তো! আমাদের অনেকের বাবা, ভাই, স্বামী ঘর ছেড়ে চলে গেছে অন্ধ্রপ্রদেশে, এখানে চাষবাসের কী হবে! এই ভেবে তারা সত্যিই বাড়ির পুরুষদের ডেকে আনল।

ঠিক তার পরে শুরু হল পুলিশ ও সিআরপি-র যৌথ অভিযান।

ওহ লোক আনে কা বাদ, গাঁও কো চারো তরহ সে ঘের লিয়া।

আমি দণ্ডকারণ্যে পশু শিকারের গল্প শুনেছিলাম, প্রথমে জঙ্গলের খানিকটা অংশে তিন দিক জাল দিয়ে ঘিরে দেয়, তারপর হল্লা করে, ক্যানেস্তারা পিটিয়ে বুনো শুয়োর অথবা হরিণকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় জালঘেরা অংশের ভিতরে। পশুটি ফাঁদে আটকে অসহায় হয়ে পড়ে এবং অচিরে সমবেত শিকারিদের মুগুর ও বল্লমের ঘায়ে খুন হয়।

সোনিজির কথা শুনে মনে হচ্ছে, পুলিশও অমন করে বরকাপালের আদিবাসীদের মারতে চাইছিল। সেই উদ্দেশ্যে তাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে ফাঁদে ফেলল।

সোনিজি বলে চলেছেন, বরকাপাল গ্রামের মানুষ একদিন ভোরবেলায় দেখল, পুরো গ্রাম ঘিরে ফেলেছে পুলিশ আর সিআরপি। পুলিশ হুকুম দিল, গ্রামের মধ্যে যে যেখানে আছিস, সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে দাঁড়া।

পুরে লোগ, ওহ গাঁও কি পুরুষ ভি, মহিলা ভি এককাট্টা হুয়ে। তব পুলিশ নে বোলা, চলনা হ্যায়।

তারপর পুলিশ বলল, এবার চল আমাদের সঙ্গে।

গ্রামবাসীরা ভয়ে আকুল, কাঁহা যানা হ্যায়? কোথায় যাব?

তব বোলা কি, চলো বরকাপাল ক্যাম্প কি অন্দর যানা হ্যায়। উহাঁ মিটিং করনা হ্যায়।

বরকাপাল ক্যাম্পের ভিতরে যেতে হবে। ওখানে তোদের সঙ্গে মিটিং করব।

তো পুরুষ ভি গয়ি, মহিলায়েঁ ভি গয়ি। য্যায়সা হি ক্যাম্প মে পহুঁচে, তো পুরুষোঁ কো অন্দর লে কে গয়া, মহিলায়োঁকো বাহার কর দিয়া।

ক্যাম্পে যাওয়ার পরে পুরুষদের আলাদা করে ভিতরে ঢুকিয়ে নিল। মেয়েদের বলল, তোরা বাইরে বোস।

সকাল ন'টা থেকে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত মেয়েরা বাইরে বসেই রইল। কারও খাওয়া জোটেনি। পানীয় জল পর্যন্ত পায়নি। তারপর কয়েকজন পুলিশ ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসে বলল, এই, তোরা বাড়ি ফিরে যা।

মহিলায়েঁ বোলে, হামারা পুরুষ অন্দর মে হ্যায় তো হম ক্যয়সে জায়েঙ্গে ঘর মে।

এদিকে পুরুষদের তো দিনভর সিআরপি ক্যাম্পে কাজ করাচ্ছিল। তাদের দিয়ে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করাল, ঘর মেরামত করাল, এক জায়গায় চালের টিন ভেঙে পড়ছিল, সেখানে নতুন টিন লাগাল, এইরকম আরও কত কাজ করিয়ে নিল।

কাম করনে কে বাদ ওহ লোগোঁ নে বোলা, অব তো হমকো জানে দো। এবার আমাদের বাড়ি যেতে দিন।

তব সিআরপি বোলা, তুমলোগ দিনভর কাম কিয়া, ইসি লিয়ে হম লোগ খানা খিলায়েঙ্গে। খানা-উনা খিলাকে হম লোগ ভেজ দেঙ্গে ঘর।

মেয়েরা ভাবল, সত্যিই তাদের বাড়ির পুরুষদের খাইয়ে দাইয়ে ছেড়ে দেবে। এই ভেবে তারা বাড়ি চলে গেল।

তারপর কেটে গেল পুরো রাত। একজনও বাড়ি ফিরল না। ভোর হতে মেয়েরা ফের দল বেঁধে গেল সিআরপি ক্যাম্পে, পুরুষরা কোথায়? ওরা বাড়ি ফেরেনি কেন?

পুলিশরা যেন আকাশ থেকে পড়ছে এমন ভাব দেখিয়ে বলল, তোরা কাদের কথা বলছিস? কাল তো কেউ আসেনি এখানে।

মেয়েরা তর্ক করতে লাগল, হামারা পুরুষোঁ কো তো তুম কাল হিঁয়াসে লায়া, হম সব শাম তক থে...।

পুলিশ তখন বন্দুক উঁচিয়ে ভয় দেখাল, তুম লোগ ঝুট বোলতে হো। বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারতে মারতে মেয়েদের ক্যাম্প থেকে বার করে দিল। সেই সঙ্গে অকথ্য গালি।

তারপর দশ দিন কেটে গেল। কারও খবর নেই। মেয়েরা তো ভেবে আকুল, বাড়ির পুরুষরা বেঁচে আছে কিনা তাও জানতে পারছে না। কার কাছে গেলে খবর পাবে তাও জানে না।

তারা ফের ক্যাম্পে গেল। আবার ডান্ডা মেরে ভাগিয়ে দিল। তারপর সুকমা গেল, দোরনাপালে থানায় গেল, আরও কত থানায় থানায় ঘুরল, কিন্তু কিচ্ছু বলতে পারল না। থানে সে ইয়ে বোলা যাতা, তুম ঝুট বোলতে হো। ইঁহা পে কিঁউ আতে হো। তব উনকে লাগা কি অব সোনি সোরি কো পাস যায়ে।

পুলিশ-প্রশাসনের কেউ যখন তাদের কথায় কান দিল না তখন তারা ভাবল, একবার সোনি সোরির কাছে যাওয়া যাক।

ওরা আমার খোঁজে গেল দান্তেওয়াড়ায়। আমিও সেদিন একটা কাজে দান্তেওয়াড়ায় গিয়েছিলাম। আমার ভাই বলল, বরকাপাল সে তিশ-পঁয়তিশ মহিলা আপকো ঢুঁড়তে বাস স্ট্যান্ড মে পড়ি হ্যায়।

আমি খবর পেয়ে বাসস্ট্যান্ডে হাজির হলাম। সেখানে মহিলারা বসে আছে। সবাই নাচার, অসহায়। আমাকে দেখেই বলল, হামারা পুরুষ গায়েব হ্যায়।

হম নে পুছা, কিতনে দিন সে গায়েব হ্যায়?

ওরা বলল, দিন দশেক হয়ে গেছে। নেহি মিল রহা হ্যায়। অ্যায়সা লাগা কি হামারা পুরুষোঁ কো মার দিয়া হ্যায় পুলিশ।

তখন অনেক চেষ্টা করে প্রেস কনফারেন্স করালাম। রিপোর্টারদের বললাম, এই মহিলাদের স্বামীরা নিখোঁজ। উনকো ইস বাত কি তকলিফ হ্যায় কি উনকা পুরুষ জিন্দা হ্যায় কি নেহি। মেয়েরা অনেকে ওই সব কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল। পরদিন মিডিয়া নে আচ্ছে সে উঠায়া।

তারপর মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে আইজি-র কাছে গেলাম। সেখানে শুনলাম, তারা বেঁচে আছে। উনকো কাল অ্যারেস্ট কিয়া হ্যায়।

একবার ভাবুন ব্যাপারটা, দশ দিন আগে ওদের বন্দি করেছে আর বলছে কিনা, কাল অ্যারেস্ট কিয়া গয়া। ফুলবগড়ি জঙ্গলো মেঁ ঘেরাবন্দি করকে চালিশ মাওবাদীয়োঁ কো পকড় লিয়া।

ওরা নাকি একসঙ্গে চল্লিশ জন মাওবাদীকে ধরে ফেলেছে। এরকম আগে কখনও হয়নি। একেবারে এতজন মাওবাদীকে ধরে ফেলল?

আমি ওদের জামিনের আর্জি জানাব। ইহাঁ তো বাতিল হো জায়েগা লেকিন হম হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট তক লড়েঙ্গে।

সোনিজির কথা শুনে মনে হচ্ছে, চিন্তলনাড়ের ঘটনায় মাওবাদীরা এক অরণ্যবাসিনীর ওপরে নির্যাতনের প্রতিশোধ নিয়েছিল। অন্যদিকে বরকাপালের ঘটনায় সিআরপি আক্রান্ত হওয়ার পরে গ্রামবাসীদের ওপরে প্রতিশোধ নিয়েছে। এখানে কেউ কাউকে ছাড়তে রাজি নয়।

যে চল্লিশ জনকে কোর্টে তুলেছে, তাদের জামিনের জন্য সোনিজি লড়ছেন। হয়তো ওরা জামিন পেয়েও যাবে। তারপর ঘরে ফিরবে। কিন্তু যাদের কোর্টে তোলেনি তারা কখনই ফিরবে না।

সোনিজি নিহত মাওবাদীদের পরিবারের বাচ্চাদের কথা বলছিলেন। যারা মাওবাদীদের হাতে মারা পড়ে, সরকার তাদের ঘরের শিশুদের জন্য টাকাকড়ি দেয়। কিন্তু মাওবাদীরা মরলে কিছু দেয় না। তাও সোনিজি কয়েকজন শহিদের সন্তান-সন্ততির জন্য সরকারি সুবিধা আদায় করেছেন।

সোনিজির বাড়ি থেকে যখন বেরচ্ছি, তখন ঘড়িতে দেখলাম রাত দশটা। তার আগে উনি খাইয়েছেন ভাত, ডাল, সবজি, মুরগির মাংস। বেশ কয়েক দিন বাদে বাড়ির রান্না খেলাম।

রাতে ফিরলাম জগদলপুরে। নায়ার গেস্ট হাউস নামে এক জায়গায় শোওয়ার ব্যবস্থা। আমাদের সকলেই সম্ভবত সেই রাতে ভাবছিল, এবার ছত্তিশগড় আসা বৃথা হল। অরণ্যে তো ঢুকতেই দিল না। যা কিছু জানলাম সবই সোনি সোরির মুখ থেকে শুনে।

সোনিজির কথাগুলো কিন্তু খুব মূল্যবান। আমি মোবাইলে রেকর্ড করে নিয়েছি। পরে ফের শুনলাম। শুনতে শুনতে মনে হল, পুলিশ-সিআরপি-র অ্যাকশনের একটা নির্দিষ্ট ছক আছে।

বরকাপালের কথাই ধরা যাক।

পুলিশ প্রথমে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে পলাতকদের বাড়ি ফেরাল। তারপর গ্রামের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জড়ো করে সিআরপি ক্যাম্পে নিয়ে গেল। ওরা নিশ্চয় প্রথমেই ভেবে নিয়েছিল, শুধু পুরুষদের বন্দি করবে। তা হলে মেয়েদেরও নিয়ে গেল কেন?

ওরা সম্ভবত ভেবেছিল, বেছে বেছে পুরুষদের নিয়ে যেতে গেলে গ্রামবাসীরা খারাপ কিছু সন্দেহ করবে, বাধা দেবে, তাই বলল, তোরা সবাই মিলে চল, ক্যাম্পে মিটিং হবে।

তারপর পুরুষদের দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিল। পুলিশ ঠিক করে নিয়েছিল, বন্দি পুরুষদের অন্তত অর্ধেককে বাঁচিয়ে রাখা হবে না। খুন করার আগে তাদের দিয়ে ক্যাম্পের কষ্টসাধ্য কাজগুলো করিয়ে নিয়েছিল।

ওখানকার পুলিশ-সিআরপি-কে নিশ্চয় গণহত্যার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়েছে। না হলে এত ঠান্ডা মাথায় খুনের পরিকল্পনা কার্যকর করা যায় না।

কিন্তু ওরা কীসের ভিত্তিতে ঠিক করল, কাকে বাঁচিয়ে রাখা হবে আর কে মরবে?

আমি বইতে পড়েছি, নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের প্রহরীরা অনেকসময় নিজেদের খুশিমতো ঠিক করত বন্দিদের মধ্যে কে বাঁচবে আর কাকে মরতে হবে। কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না।

কিন্তু সাতের দশকের শুরুতে শুনতাম, আমাদের রাজ্যে পুলিশ খুব ভেবেচিন্তে ঠিক করে নকশাল বন্দিদের মধ্যে কে মরবে আর কাকে বাঁচিয়ে রাখা হবে।

পুলিশ নিয়মিত জেলের মধ্যে নকশালদের জেরা করে দেখত, কাদের মনোবল এখনও অটুট, কোন ছেলেরা জেল ভেঙে পালিয়ে ফের বাইরের আন্দোলনে যোগ দিতে চায়। বন্দিদের মনোভাব বিশ্লেষণের জন্য অনেক সময় মনোবিদের সাহায্য নিত। এইভাবে বেছে বেছে কয়েকজনকে গভীর রাতে নিয়ে যেত থানা লক আপের বাইরে। নদীর তীরে অথবা অপর কোনও নির্জন জায়গায় গিয়ে জিপ থামিয়ে বলত, যা তোদের ছেড়ে দিলাম, বাড়ি যা। আর কখনও এমন করিসনি।

তারা একটু দূর যেতেই পিছন থেকে গুলি। পরদিন খবরের কাগজে হেডলাইন, বন্দিরা বোমা নিয়ে আক্রমণ করেছিল, পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়েছে।

অনেক সময় মেরে রাস্তার ওপরে ফেলে দিয়ে আসত, নদীতে ভাসিয়ে দিত, গোপনে লাশ পুড়িয়ে দিত। তাদের মেরেছে বলে পুলিশ স্বীকারই করত না। পুলিশের খাতায় লেখা থাকত, ওরা 'নিখোঁজ'।

বরকাপালের পুরুষরা যখন সিআরপি ক্যাম্পে আটকে পড়ল, তখন তাদেরও নিশ্চয় জেরা, মারধর ইত্যাদি করে বুঝতে চেষ্টা করেছিল কারা মাওবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। সেইমতো কয়েকজনকে খুন করে মাটি চাপা দিয়েছে। অথবা ভাসিয়ে দিয়েছে নদীর জলে।

আমরা জানি, নয়াদিল্লির নর্থ ব্লকের ঠান্ডা ঘরে এমনতর ফাঁদ পেতে মানুষ শিকার এবং খুনখারাপির ষড়যন্ত্র হয়। স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বড় বড় আমলারা মাওবাদী বিদ্রোহ দমনের ছক সাজায়।

ওই আমলারা প্রায়শই পাবলিকের পয়সার শ্রাদ্ধ করে বিলেত-আমেরিকা ঘুরে আসে। ইজরায়েলেও যায়। সাহেবদের কাছে কাউন্টার ইনসার্জেন্সি অপারেশনের ট্রেনিং নিয়ে আসে। অতীতে কীভাবে বিভিন্ন দেশে শাসকরা কমিউনিস্ট বিদ্রোহ দমন করেছে, তা নিয়ে পড়াশোনাও করে। সেই অনুযায়ী ছক তৈরি হয়। নিচুতলার পুলিশ ও সিআরপি সেই ছক অনুযায়ী কাজ করে।

সাতের দশকেও এমন করেছিল।

সেবার পুলিশের নকশাল মারা অভিযানের কোড নাম ছিল দু'টি, পাপা ডক আর টনটন মাকোইট।

ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে হাইতি নামে একটি দ্বীপ আছে, পাপা ডক ছিলেন সেদেশের একনায়ক। ভদ্রলোক ছ'য়ের দশকের শুরুতে কমিউনিস্টদের দেশ থেকে একেবারে ঝাড়েবংশে নিকেশ করেছিলেন। তাঁর অনেকগুলো খুনে স্কোয়াড ছিল, তাদের বলত টনটন মাকোইট।

হাইতির রূপকথায় টনটন মাকোইট নামে এক চরিত্রের খোঁজ পাওয়া যায়, সে অনেকটা ভয়বুড়ো টাইপের, যে বাচ্চারা বাবা-মায়ের কথা শোনে না তাদের ধরে নিয়ে যায়।

পাপা ডকের ডেথ স্কোয়াডগুলোও অবাধ্য ছেলেদের ধরে নিয়ে যেত। তাই তাদের নাম টনটন মাকোইট।

আমাদের দেশের পুলিশ সাতের দশকে কেন পাপা ডক আর টনটন মাকোইটের নাম নিয়েছিল?

আমার ধারণা, সেবার কমিউনিস্ট দমনে হাইতির ধাঁচে ছক সাজিয়েছিল। তাই অমন কোড নেম।

এবার কমিউনিস্ট দমনে হোম মিনিস্ট্রির কর্তারা কী ধাঁচে ছক সাজিয়েছে?

আমি ঠিক জানি না। তবে মনে হয় ওরা ইজরায়েলের মডেল অনুযায়ী কাজ করছে। ওদেশে মোসাদ নামে এক গুপ্তচর বাহিনী আছে, বিদ্রোহ দমনে তাদের তুল্য পাকা মাথা নাকি দুনিয়ায় আর কারও নেই। খুনখারাপিতে তারা সিআইএ-রও ওপর দিয়ে যায়। আমাদের দেশের কাউন্টার ইনসার্জেন্সি এক্সপার্টদের সঙ্গে মোসাদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সম্ভবত ওদের পরামর্শে মাওবাদী দমন অভিযানের নীল নকশা তৈরি করেছে।

যারা ওই অভিযানের মোকাবিলা করতে চায়, তাদের সংশ্লিষ্ট নকশাটি খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। তবে সাফল্য আসবে।

৯

চোদ্দই আগস্ট, সকাল আটটা

গৌতম নাভালকা এবং আরও কয়েকজন প্রেস বিবৃতি তৈরি করতে ব্যস্ত। দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলন। একটু বেলা হতেই বেলা ভাটিয়া আর সোনি সোরি হাজির। সোনিজির সঙ্গে জনা পনের আদিবাসী ছেলেমেয়ে। তাদের বয়স কুড়ি-বাইশ। তাদের মুখের ভাব অনেকটা ক্লাসে ফেল করা ছেলেদের মতো, খুব কাঁচুমাচু। কেন অমন অবস্থা, সেকথা পরিষ্কার করে দিলেন সোনিজি নিজেই।

ওরা সালওয়া জুডুমের হয়ে কাজ করত।

ওদের খুব কম বয়সে মাওবাদী মারা অভিযানে ভিড়িয়ে নিয়েছিল। মাইনে মাসে দু'-তিনহাজার টাকা। বেচারারা গরিব, ওদের কাছে দু'-তিনহাজার মানে অনেক। তার ওপরে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিত, তোদের অনেক উন্নতি হবে, যত মাওবাদী মারবি তত উন্নতি, একসময় সরকারি চাকরিও পেয়ে যাবি, তব জিন্দেগি বন যায়েগা।

সালওয়া জুডুম শেষপর্যন্ত মাওবাদীদের সঙ্গে পেরে উঠল না। অনেক পরে সুপ্রিম কোর্টেরও টনক নড়ল, তাই তো, সভ্য দেশে এমন প্রাইভেট মিলিশিয়া চলতে দেওয়া উচিত নয়।

সালওয়া জুডুম সরকারিভাবে বন্ধ হয়ে গেল বটে কিন্তু আদিবাসী গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েদের পুলিশের সহায়ক হিসাবে নিয়োগ করা বন্ধ হয়নি। তাদের নতুন নাম হয়েছে স্পেশ্যাল পুলিশ অফিসার। সংক্ষেপে এসপিও।

যে সব আদিবাসী গ্রামে বিদ্রোহ ঘনিয়ে ওঠে, পুলিশ মূলত সেখান থেকে কয়েকজনকে এমন খোচড় বানায়। প্রায়ই নতুন নতুন ছেলেমেয়েকে এসপিও হিসাবে নিয়োগ করে। তাদেরও একই প্রতিশ্রুতি দেয়, দু'দিন বাদেই তোদের অনেক মাইনে বাড়বে, সরকারি চাকরিও পাবি, তব লাইফ বন যায়েগা।

এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার মাওবাদী মারার জন্য যে টাকা পাঠায়, তার পরিমাণ তো সীমিত। সেখান থেকে আবার চুরি হয়, অনেক টাকা নানাভাবে অপচয় হয়ে যায়। যেটুকু পড়ে থাকে, তাতে বেশি সংখ্যক এসপিও পোষা যায় না। তাই নতুন ছেলেমেয়েদের নেওয়ার সময় আগে যাদের রিক্রুট করেছিল, তাদের অনেককে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তাড়িয়ে দেয়। তোদের আর চাকরি নেই। তোরা এখন যা। দিল্লি থেকে ফান্ড পাঠায়নি। সরকারি ব্যাপার তো, বুঝতেই পারছিস। মাঝে মাঝে খবর নিস। ফান্ড এলে আবার চাকরি পাবি।

পুলিশকর্তারা বলেই খালাস, কিন্তু একবার যারা সালওয়া জুডুমের চক্করে পড়েছে তাদের আর গ্রামে ফেরা হয় না।

কী করে ফিরবে গ্রামের লোক তো তাদের শত্রু।

তারা এতদিন পুলিশ-সিআরপি-র সঙ্গে গিয়ে গ্রামে কত অত্যাচার করেছে, অনেককে মাওবাদী বলে ধরিয়ে দিয়েছে, আর এখন গ্রামে ফিরলে মানুষ কি তাদের ছেড়ে দেবে! মাওবাদীরাও বাগে পেলে ছাড়বে না।

তাই তারা বাধ্য হয়ে শহরেই থেকে যায়। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। ছোটখাটো কাজ করে তাদের ক্ষুণ্নিবৃত্তি হয়। কিন্তু এইভাবে তো জীবন চলে না। শেষকালে ওরা সোনিজির শরণ নিয়েছে, দয়া করে আমাদের জন্যও কিছু একটা করুন।

আমরা হোটেলের একটা ঘরে মেঝেয় সতরঞ্চি পেতে ছেলেমেয়েগুলোকে বললাম, বৈঠিয়ে। আমরাও বসলাম। ওদের গায়ে বেশ রঙচঙে জামাকাপড়। একটি ছেলের বয়স একটু বেশি মনে হল, সোনিজি বললেন, ওই তো দলের নেতা।

গৌতম নাভালকা ওদের বোঝাতে লাগলেন, শোনো, দু'হাজার আঠার সালে রাজ্যে অ্যাসেম্বলি ইলেকশন আছে। তামাম পার্টিওয়ালোঁ সে পুছিয়ে, আপ হামারে লিয়ে কেয়া কর রহে হ্যায়? সাধারণ মানুষকে বলুন, ইনলোগোঁকো ভোট মত দো। ইন লোগোঁ নে আদিবাসীয়োঁ কা ইস্তেমাল করতে হ্যায়। করকে ফেক দেতে হ্যায়। অব দেখিয়ে কেয়া অসর পড়তা হ্যায়।

লেকিন একেলা বাত করেঙ্গে তো উসকো অসর নেহি হোগা। সংগঠন তৈরি করুন। তার একটা জবরদস্ত নাম দিন। সালওয়া জুডুম পীড়িত এসপিও বা এই জাতীয় কিছু।

আমরা একসঙ্গে লড়াই করব। আপনাদের ফোন নম্বর দিন।

ওরা এতক্ষণ ভাবলেশহীন মুখে গৌতমের কথা শুনছিল। যে ছেলেটি ওদের পাণ্ডা গোছের সে গালে খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে যাচ্ছিল। কী ভাবছিল কে জানে! ফোন নম্বর চাইতে নড়েচড়ে বসল। সোনিজি একটা সাদা কাগজে সবার ফোন নম্বর লিখে গৌতমকে

দিলেন।

আমরা বুঝতে পারলাম, এই অরণ্যময় প্রদেশে সোনি সোরি স্বামীহারাদের নেত্রী, শহিদ পরিবারের শিশুদের রক্ষক এবং যে গরিবরা প্রতিবিপ্লবে যোগ দিয়ে বিপদে পড়েছে তাদেরও ভরসাস্থল। এখানে যারা ভীষণ বিপদে পড়ে, তারা বিপ্লবী অথবা প্রতিবিপ্লবী যে শিবিরেরই হোক না কেন, শেষপর্যন্ত তাঁরই শরণ নেয়।

দুপুর বারোটা

প্রেস কনফারেন্স। দোতলার একটা বড় ঘরে জনা দশ-বারো রিপোর্টার উপস্থিত। গৌতম তাদের সামনে ব্রিফ করলেন, বস্তার অঞ্চলে সংঘাতের অন্যতম প্রধান কারণ হল জমি। সেই পাঁচের দশকে এখানে বয়লাডিলার জমি অধিগ্রহণ করেছিল। তারপর আরও অনেক জমি গেছে।

নগরনার অঞ্চলে প্রথমে মুকুন্দ স্টিল লিমিটেড একটি কারখানা গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় লোকজনের তীব্র বিরোধিতার মুখে পালিয়ে যায়। পরে এনএমডিসি ওখানে জমি অধিগ্রহণ করে। কিন্তু জমিহারাদের চাকরি ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। এখন ওই সংস্থা আরও জমি চাইছে। কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে, কারখানাটি বেসরকারি হাতে দেবে।

আমাদের দাবি: জমিহারাদের প্রতিশ্রুতিমতো ক্ষতিপূরণ দাও। আর জমি অধিগ্রহণ নয়। বেসরকারি হাতে কারখানা তুলে দেওয়া নয়। শ্রম আইন মানতে হবে। আদিবাসীদের জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন মানতে হবে। কারখানা চালু হলে যাতে সমাজ অথবা পরিবেশের ক্ষতি না হয় তাও নিশ্চিত করতে হবে।

তারপর পালমেরের কথা। গত একত্রিশে জুলাই ওখানকার আদিবাসী বালিকা বিদ্যালয়ে সিআরপি জওয়ানরা কতিপয় ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করে। ব্যাপারটা খুবই উদ্বেগজনক। আমরা জানতে চাই, গার্লস হোস্টেলের মধ্যে এক প্রাইভেট টিভি চ্যানেলকে রাখিবন্ধন উৎসব করার অনুমতি দিল কে? জেলাশাসক বলেছেন, তিনি এসম্পর্কে বিন্দুবিসর্গও জানতেন না।

আমাদের দাবি: গার্লস হস্টেলে ওই অপ্রীতিকর ঘটনার সময় পুলিশ ও সিআরপি-র উচ্চপদস্থ অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউ কর্তব্য পালন করেননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দাবি করছি, তদন্তের দায়িত্ব সিবিআইকে দেওয়া হোক। বিচারবিভাগীয় নজরদারির আওতায় সিবিআই তদন্ত করুক। প্রত্যেক দোষী যাতে শাস্তি পায়, তা নিশ্চিত করা হোক।

এবার বরকাপালের কথা। গত মার্চ-এপ্রিল মাসে বরকাপালে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কয়েকটি ঘটনার কথা শোনা যায়। পুলিশ নাকি বরকাপাল ও তার আশপাশ থেকে অনেককে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু তাদের পরিবারকে সেকথা জানায়নি। বন্দিদের পরিবারের লোকজন যখন সোনি সোরির সঙ্গে যোগাযোগ করে, তখন প্রশাসন তড়িঘড়ি জানায়, মাওবাদী দমন অভিযানে অনেকে ধরা পড়েছে। এই বলে বরকাপাল থেকে বন্দি হওয়া চল্লিশ জনকে কোর্টে তোলে। আরও অন্তত চল্লিশ জনের কোনও খোঁজ নেই।

এই ঘটনাগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ নেওয়ার জন্য আমরা সিডিআরও-র পক্ষ থেকে বরকাপালে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ আমাদের যেতে দেয়নি। আমরা ঘণ্টা ছ'য়েক ধরে পুলিশকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তারা বলল, পনেরই আগস্টের আগে কিছুতেই আমাদের জঙ্গলে ঢুকতে দেবে না। জঙ্গলের পথে নাকি আইইডি পাতা থাকতে পারে। তবে পনেরই আগস্টের পরে এলে ঢুকতে দেবে বলেছে।

বেলা তিনটে

অনেকক্ষণ হল সাংবাদিক সম্মেলন শেষ হয়ে গেছে। এবার বিদায় নেওয়ার পালা। এক এক করে পাঞ্জাব থেকে আগত দুই বন্ধু, গৌতম নাভালকা ও আরও অনেকে চলে যাচ্ছেন। আমাদের বাস রাত দশটায়। এখন হোটেল ছেড়ে কোথায় যাব ভাবছি। অনেকটা সময় কাটাতে হবে তো।

এমন সময় হোটেলের মালিককে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা এই হোটেলের চেক আউট টাইম কখন? সে বলল চব্বিশ ঘণ্টা। আমরা বললাম, কাল রাত বারোটায় তোমাদের হোটেলে এসেছি, আজ রাত বারোটা অবধি থাকতে পাব তো? সে বলল, জরুর।

সেকথা শুনে গৌতম ও পাঞ্জাবের দুই ভদ্রলোকও রয়ে গেলেন। হোটেলেরই একটি ছেলে রান্না করে দিল ভাত, ডাল সবজি। তারপর খানিক ঘুম। শ্যামসুন্দরবাবু বাসের টিকিট কেটে আনলেন, রাত দশটা পনেরয় ছাড়বে। তারপর আর এক দফা ঘুম দিয়ে নেওয়া গেল।

পনেরই আগস্ট। সকাল

আমরা রায়পুরে। সারা দিন এখানেই কাটাতে হবে। হাওড়াগামী ট্রেন রাতে। মালপত্র নিয়ে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে আশ্রয় নিয়েছি। আজ দিনভর অখণ্ড অবকাশ।

আমি ভেবেছিলাম দণ্ডকারণ্যে গিয়ে জানতে পারব মাওবাদী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি কোনদিকে। তেমন কিছু জানা গেল কি?

আমি প্রথমবার দণ্ডকারণ্যে আসি দু'হাজার তের সালে। সেবার মাওবাদীদের জনাতনা সরকারের নিজস্ব ট্রাক্টরে চড়ে ঘুরেছিলাম। বনের মধ্যে ট্রাক্টর ছাড়া আর কোনও গাড়ি চলতে পারে না।

সেবার ওদের নানা উন্নয়নমূলক কাজ দেখিয়েছিল, ছোট ছোট বাঁধ বানিয়েছে, নতুন নতুন ফসল চাষ করছে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছে, র‍্যাশনালি চিন্তাভাবনা করতে শেখাচ্ছে, সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে, কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রভাবে সুপ্রাচীন অরণ্যের অভ্যন্তরে মানুষের জীবন আর আগের মতো নেই।

তার পরেরবার আসা দু'হাজার ষোল সালে। তখন দ্বিতীয় দফায় অপারেশন গ্রিন হান্ট চালু। একেবারে দমন-পীড়নের স্টিম রোলার চালিয়ে দিয়েছে। মাওবাদীরা অনেক জায়গা থেকে পিছু হটছে। তাই জনাতনা সরকার আমাদের জন্য ট্রাক্টর পাঠাতে পারেনি। তাও নিজেদের উদ্যোগে জঙ্গলে কিছুদূর পর্যন্ত ঢুকেছিলাম। কয়েকটা গ্রাম দেখলাম। স্থানীয় মানুষ বলল, সিআরপি অনেককে খুন করেছে। তিনজনের ডেডবডি দেখলাম।

তৃতীয়বারে গিয়ে দেখি, আমাদের নিয়ে যেতে গাইড তৈরি। অরণ্যের ভিতর ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য ট্রাক্টরও রেডি। তার মানে মাওবাদীরা আবার হারানো জায়গা দখল করেছে। জনাতনা সরকারও পুনরায় চাঙ্গা। পুলিশ-সিআরপি বেকায়দায়। মাওবাদীদের শায়েস্তা করতে না পেরে গ্রামে গ্রামে ঢুকে যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই মারছে। আগের চেয়ে মারপিট, ধরপাকড় বেড়েছে অনেক গুণ।

ওই জন্য আমাদের বনে ঢুকতে দিল না। গেলেই তো লোকে আমাদের কাছে ওদের নামে যা তা কথা বলবে।

আমি তিনবারের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছি, দণ্ডাকারণ্যে কখনও মাওবাদীরা বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে, আবার কখনও পুলিশ-আধা সেনার দাপট বৃদ্ধি পায়। মাও সে তুং বলেছেন, জনযুদ্ধে এমন হওয়াই নিয়ম। কখনও বিদ্রোহীরা জয়লাভ করে, কখনও রাষ্ট্র। যখন রাষ্ট্র জিতে যায় তখন জনগণের ওপরে ব্যাপক অত্যাচার করে। যাতে কেউ আর ভবিষ্যতে বিপ্লবীদের দলে যোগ দিতে সাহস না পায় সেজন্য অমন করে।

তা বলে পরাজয়ের কালে বিপ্লবীদের হাল ছেড়ে দিতে নেই। বরং শত্রুকবলিত এলাকা থেকে পিছিয়ে গিয়ে, খানিক দূরে লুকিয়ে থাকতে হয়। শত্রুর ওপরে নজর রাখতে হয়, কখন সে অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকে। সেই সুযোগে ফের এগিয়ে এসে আঘাত হানার পালা। এইভাবে যারা আগুপিছু করে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে, তাদের জয় অনিবার্য।

মাওয়ের কথায়, লেগে থাকার মানেই বিজয়।

আমাদের দেশের মাওবাদীরাও সেই নকশালবাড়ির সময় থেকে লেগে আছে। কিন্তু চিনদেশের মতো এখানে জয়লাভ করতে পারবে কি?

আমি আগেই বলেছি, গত কয়েক দশক জুড়ে দণ্ডকারণ্যে চলমান জনযুদ্ধ অন্তর্বস্তুতে আর্য ও অনার্যদের অতি প্রাচীন সংঘাতের ধারাবাহিকতা মাত্র। তাতে অনার্যরা বহুবার ভয়ানক বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। ছোটখাটো অনেক খণ্ডযুদ্ধে বিজয়ীও হয়েছে। কিন্তু শেষ অবধি পেরে ওঠেনি।

আপাতত মাওবাদীরাও দণ্ডকারণ্যে সাহসী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় আপার হ্যান্ড নিচ্ছে। কিন্তু শেষ অবধি কী হবে?

ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কি পুনরায় জয়লাভ করবে?

অন্যভাবে বলা যায়, বারে বারে পৌরাণিক কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করাই কি ভারতবর্ষের নিয়তি হয়ে থাকবে? নাকি অন্য কিছু হবে?

ব্যাপারটা ভীষণ সিরিয়াস। তাই একবার পূর্বাপর বিশ্লেষণ করে দেখা জরুরি।

ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র কেন জয়ী হয়েছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ। অনার্যদের একটি অংশ তাঁকে সাহায্য করেছিল। তাঁর সেনাদল অনার্যদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল এবং স্বয়ং শত্রুর ভাই বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিল অনেক গুপ্তকথা।

সুগ্রীব এবং বিভীষণ, দু'জনকে রাজত্বের লোভ দেখিয়ে রামচন্দ্র নিজের দলে ভিড়িয়ে নিয়েছিলেন। এই স্বজাতিদ্রোহীরাই রাবণ রাজার পতন ডেকে এনেছিল।

রামায়ণের এই কাহিনি থেকে মনে হয়, আর্যরা অতীতে প্রায়শই অনার্যদের দেশ দখল করার জন্য একটা উপজাতিকে অপর উপজাতির বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিত। কখনও অনার্য রাজার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে থেকে কোনও বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বার করত। তার মাধ্যমে জেনে যেত শত্রুর গোপন খবরাখবর।

একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হল, যে অনার্য উপজাতিরা আর্যদের সাহায্য করেছিল, তাদেরও আর্য ঋষিরা কদাপি মানুষের মর্যাদা দেয়নি। বানর, ভাল্লুক, রাক্ষস ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছে। তাতে ঋষিদের নিচু মন ও জাতিবিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আধুনিক যুগেও দেশদ্রোহীর অভাব হয়নি। বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্য না পেলে ইংরেজরা পলাশির যুদ্ধে জিততে পারত না। তারপর অতদিন ধরে ভারতবর্ষকে শাসনও করতে পারত না।

রামায়ণে আছে, সুগ্রীব, বিভীষণ প্রমুখকে রামচন্দ্র রাজত্ব পাইয়ে দিয়েছিলেন। অনার্যদের মধ্যে যারা স্বজাতিদ্রোহী, তাদের আর্যরা দু'হাত ভরে উপঢৌকন দিত। আধুনিক যুগে যারা ব্রিটিশদের সাহায্য করেছিল, তারাও ধনসম্পত্তি কম পায়নি।

আগেকার দিনে কলকাতায় তাদের বলত বাবু। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে তারা গ্রামে জমিদারীও কিনেছিল। সেখানে চাষিদের গলায় পা দিয়ে খাজনা আদায় করত আর কলকাতায় বাইজি, আতসবাজি, বুলবুলির লড়াই ও আর অনেক কিছু নিয়ে খুব জাঁকজমক করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। সাহেবরা ওদের ভালোবেসে রায়বাহাদুর, রায়সাহেব খেতাব দিয়েছিল।

তারপর একসময় প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনের দিন ঘনিয়ে এল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষের দিকে, তখন দেখা গেল, এদেশের লোকে ভীষণ ক্ষেপে গেছে, সাহেবদের তাড়িয়ে ছাড়বে। সেই হেতু বিয়াল্লিশ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন এবং তার পরে ছেচল্লিশে নৌ বিদ্রোহ, রশিদ আলি দিবস ও আরও অনেক ছোটবড় অভ্যুত্থান হয়েছিল। সাহেবরা দেখল বেগতিক। তখন ওই বাবুদের যত নাতিপুতিকে মসনদে বসিয়ে প্রচার করে দিল, ভারত স্বাধীন হয়েছে।

সেই থেকে বাবুদের ছানাপোনারা আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক ইত্যাদি হয়ে আসছে। ওদেরই অনেকে আজও 'জাতির

জনক', 'চাচা', 'লৌহমানব', 'বাংলার রূপকার' ইত্যাদি নামে পরিচিত। বড় বড় আমলাও ওদের ঘর থেকেই হয়।

অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতক ও তাদের বংশধরগণ এখনও সর্বত্র ক্ষমতায় রয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসন, পুলিশ, আধা সেনা, মিলিটারি সবকিছু তারাই চালায়। সেজন্য এই পোড়া দেশের এমন অবস্থা।

আর্যাবর্তের শাসকরা দণ্ডকারণ্যে মাওবাদী দমনে সেই পৌরাণিক স্ট্যাটেজিতেই কাজ করছিল, যাদের বিরুদ্ধে লড়াই সেই আদিবাসীদের মধ্যে থেকে বিশ্বাসঘাতকদের খুঁজে বার কর। তাদের স্বজাতির বিরুদ্ধে লড়িয়ে দাও। ওই থেকে সালওয়া জুডুমের উৎপত্তি।

মাওবাদীরা ধ্বংস হয়ে গেলে অরণ্যে সালওয়া জুডুমের জয়জয়কার হত। ওতে যে ছেলেরা যোগ দিয়েছিল, তারাও খুব লম্ফঝম্প করত, অনেক টাকাকড়ি পেত। পরবর্তীকালে তাদের কেউ হত পলিটিক্যাল লিডার, কেউ সমাজ সংস্কারক, কেউ বা সমাজসেবী।

কিন্তু তা হয়নি। বরং সালওয়া জুডুমের ছেলেমেয়েদের দেখছি, ছন্নছাড়া, বিধ্বস্ত। পুলিশ তাদের ঠকিয়েছে। উপায়ান্তর না দেখে তারা গণতান্ত্রিক শক্তির শরণাপন্ন। মাথা নিচু করে বলছে, আমরা ভুল করেছি। আমাদের রক্ষা করুন।

এর অর্থ দণ্ডকারণ্যে বিশ্বাসঘাতকরা পরাজিত হচ্ছে। আমাদের দেশের শত্রুরা বহু যুগ ধরে যাদের সহায়তায় জয়লাভ করেছে, শাসন ও শোষণ চালিয়ে এসেছে, এবার তাদের ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারছে না। বিদ্রোহীরা দেশদ্রোহীদের পরাজিত করতে এবং মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে সক্ষম হচ্ছে।

সেই হেতু আমার মনে হয়, ভারতভূমিতে কয়েক হাজার বছর ধরে চলা আর্য-অনার্য যুদ্ধের ফলাফল আগামী দিনে পাল্টেও যেতে পারে।

বিকাল ছ'টা

একটু আগে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেলেন ডাক্তার বিনায়ক সেন। ভারী সৌম্যদর্শন চেহারা। আগে দাড়ি রাখতেন। জেলবাসের সময় কামিয়ে ফেলেছিলেন। তারপর থেকে আর রাখেননি।

তিনি অতি বিনয়ী মানুষ। কথা বলেন খুব কম। শোনেন বেশি। আমি কাশ্মীরে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং নিয়ে একটা পুস্তিকা রচনা করেছি, নাম দিয়েছি 'কাশ্মীরনামা', ভাবছিলাম এক কপি তাঁর হাতে দিলে কেমন হয়?

ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি বাংলা পড়তে পারেন? তিনি হেসে বললেন, আমি তো পারিই, আমার স্ত্রীও পারে, দিন আপনার বই।

রাত সাড়ে দশটা

আমরা এখন হাওড়াগামী ট্রেনে। এবারের মতো ছত্তিশগড় সফর শেষ। আবার বনজার কথা মনে পড়ছে। মেয়েটার কী হল কে জানে! সে কি শেষ অবধি পুলিশ-সিআরপি-র বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছিল?

হায়দরাবাদে সম্মেলন

দণ্ডকারণ্যে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংয়ে গিয়েছিলাম আগস্টের মাঝামাঝি। তারপর সেপ্টেম্বরের দুই-তিন তারিখে সিডিআরও-র সর্বভারতীয় কনভেনশন হায়দরাবাদে। সেখানেও গেলাম। আবার অনেকের সঙ্গে দেখা হল।

হায়দরাবাদ মানে নিজামের শহর। ইংরেজ আমলে হায়দরাবাদ ছিল নেটিভ স্টেট, তার নবাবকে বলত নিজাম। তাদের মতো ধনী সারা বিশ্বে কেউ ছিল না। শেষ নিজামের নাম ছিল ওসমান আলি খান। ব্যাটা এমনিতে ছেঁড়া জামাকাপড় পরে থাকত কিন্তু পেপার ওয়েট হিসাবে ব্যবহার করত একশ পঁচাশি ক্যারেটের একখণ্ড হিরে। তার নাম জ্যাকব ডায়মন্ড। আজকের দিনে দাম কয়েক হাজার কোটি টাকা।

এই নিজামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চাষিরা কয়েক হাজার গ্রাম মুক্ত করেছিল। পরে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ঘাপটি মেরে থাকা বিশ্বাসঘাতকদের জন্য পরাজিত হয়। আন্দোলন নতুন করে জ্বলে ওঠে নকশালবাড়ির পরে। আটের দশকেও ওখানকার চাষিরা বহুদিন যাবৎ গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে গেছে।

আমাদের রাজ্যের জঙ্গলমহলে যিনি নকশালবাড়ির মতো একটি অভ্যুত্থানের প্রধান কারিগর ছিলেন, সেই কিষেণজিও তেলেঙ্গানার মানুষ। দু'হাজার নয় সালে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, হায়দরাবাদ তেলেঙ্গানার অংশ। নতুন তেলেঙ্গানা রাজ্যের রাজধানী হোক হায়দরাবাদ।

এবার ওই শহরে সিডিআরও-র কনভেনশন।

কি আশ্চর্য! গিয়েই দেখি সেই বনজা একেবারে মঞ্চে বসে আছে। ভাষণও দিল, পুলিশবালা গাঁও কো পুরা ভাগানে চাহতে হো। হাম লোগ গাঁও ছোড়াকে নেহি জায়েঙ্গে। হাম লোগ গাঁওমে রহেঙ্গে। মারনা পিটনা নেহি করনা চাহিয়ে। পুলিশবালা অ্যায়সেই করতে হো...।

বেশ অনেকক্ষণ ধরে ভাষণ দিল। সুরেলা গলায় টেনে টেনে কথাগুলি বলছিল। হিন্দি উচ্চারণ একটু অন্যরকম। সম্ভবত কোনও অঞ্চলের ডায়লেক্ট।

পরে একজনের কাছে শুনলাম, ওর স্বামী শহিদ হয়েছে। বেচারা অনেক কষ্টে ছেলেপুলেদের মানুষ করছে।

মঞ্চে সোনি সোরি ছিলেন, বেলা ভাটিয়া, গৌতম নাভালকা, সবাই ছিলেন। আর ছিল আমাদের বন্ধু মাধব দাস। সে আমাদের থেকে অনেক জুনিয়ার, তিরিশের কোঠায় বয়স। ঝাড়খণ্ডের ছেলে।

ছত্তিশগড় থেকে গ্রামের বধূরা অনেকে এসেছিল। তারা ডাফলির তালে তালে লোকনৃত্য প্রদর্শন করল। তার সঙ্গে গানও গাইছিল। কথাগুলো বুঝলাম না, শুধু সুরটা কানে বাজল, খুব তীক্ষ্ণ, মিঠে সুর। কোনও প্রত্যন্ত বনাঞ্চলের অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে

থেকে ওই সুরের উদ্ভব।

সোনি সোরি ভাষণে বললেন, ওই বধূরা বরকাপাল গ্রাম থেকে এসেছেন। তাঁদের স্বামীরা জেলে বন্দি। পুলিশ পুরো গ্রাম খালি করে দিতে চেয়েছিল। তাঁরা চরম বিপদের মধ্যে জল-জঙ্গল-জমিন রক্ষা করে চলেছেন।

আমার মনে হল, এই বধূরা নমস্য। তাঁরা গ্রাম বাঁচাতে প্রবল রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে লড়াই করছেন আবার লোকায়ত সংস্কৃতির চর্চা, নাচ-গান ইত্যাদিও ভোলেননি।

একসময় দেখি মাধব দাস ভাষণ দিতে উঠেছে। সে বিদ্রূপের সুরে বলতে লাগল, সরকার কিন্তু তার কাজ ঠিকঠাক চালিয়ে যাচ্ছে। গভর্নমেন্ট ইজ নট ডুয়িং ইটস ওয়ার্ক ইমপ্রপারলি। গভর্নমেন্ট ইজ মিনট টু ডু হোয়াট দে আর ডুয়িং। যে কাজ করার জন্য সরকার তৈরি হয়েছে, সরকার সেই কাজটিই করছে। আমরা কখনই আশা করতে পারি না যে সরকার সাধারণ মানুষকে অমুক দেবে, তমুক দেবে।

ইভন ইফ দে গিফট সামথিং, দেয়ার ইজ সামথিং বিহাইন্ড দ্যাট। যদি তারা কিছু দেয়, তা হলে ধরে নিতে হবে পিছনে কোনও উদ্দেশ্য আছে।

উদাহরণ হিসাবে আমি মনরেগার কথা বলতে চাই। ইট হ্যাজ বিন এ ভেরি বিগ ইস্যু অ্যান্ড ফারমারস, ভিলেজারস আর ভেরি হ্যাপি অ্যাবাউট দ্যাট। মনরেগা প্রকল্পে তারা রাস্তা বানাচ্ছে, পুকুর খুঁড়ছে, বাট হোয়াট আলটিমেটলি হ্যাপেনস? দে স্লোলি লেফট অ্যাসাইড ফ্রম দি ফার্ম। লোক আপনা মা সে আলহ হোতে হ্যায়। মানুষ ক্রমে কৃষিজমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। নিজেদের মায়ের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ভূমি হল তাদের মা। তাদের ধীরে ধীরে মায়ের থেকে দূরে সরিয়ে আনা হচ্ছে। চাষিরা হয়ে যাচ্ছে সাধারণ শ্রমিক।

এইবারে কর্পোরেটেরা আসবে জমি দখল করতে। কাজটা খুব সহজ হয়ে যাবে। কারণ চাষি তো অলরেডি জমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এ ভেরি নাইস পলিসি!

পরদিন বনজার সঙ্গে ফের দেখা হল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের যখন এএসপি সাহেবের কাছে নিয়ে গেল, তুমি ঠিকঠাক ওখান থেকে চলে আসতে পেরেছিলে তো?

সে বলল, আমি তো আগেই বুঝেছি, আপনাদের জঙ্গলে যেতে দেবে না। আপনারা ওই স্কুলে ঢুকলেন আর আমিও চলে এলাম।

-তোমাকে কবে পুলিশে ধরেছিল?

সে খানিক ভেবে বলল, দো হাজার নও মে পাকড়ি, দো হাজার পন্দের মে ছুট্টি। আভি তক কেস চল রহা হ্যায়।

-আচ্ছা, তুমি কিষেণজিকে চিনতে? কোটেশ্বর রাও? আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যিনি সংগঠন গড়তে গিয়েছিলেন, শহিদ হয়েছেন, সেই কিষেণজির কথা বলছি।

-নাম শুনা হোগা...

-সাবধানে থেকো...

সে হাসল।

আমি আবার বললাম, তোমাদের জঙ্গলে তো ঢুকতে পারলাম না, তুমি যদি কখনও কলকাতায় আস তবে আমাদের বাড়িতে ঘুরে যেও।

সে ফের এক গাল হেসে বলল, যাব।